শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ফুটপাথের দোকান

ফুটপাথের দোকান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ফুটপাথের দোকান

সংকলন সহযোগিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পত্রভারতী

www.patrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০২১

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী®, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ রঞ্জন দত্ত

FOOTPATHER DOKAN
Slice-of-life stories by Shirshendu Mukhopadhyay
Published by PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

ISBN 978-81-8374-661-8

" রা-স্বা "

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই

কিশোর সাহিত্য

সিন্দুক খুললেই চল্লিশ

এককুড়ি একডজন

ভৌতিক গল্প সমগ্র

ঝুড়ি কুড়ি গল্প

ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

বয়স্ক সাহিত্য

শীর্ষেন্দু ৭৫

হারিয়ে যাওয়া লেখা ১

হারিয়ে যাওয়া লেখা ২

হারিয়ে যাওয়া লেখা ৩

শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু

শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১

মনের অসুখ

ঈগলের চোখ

পাঁচটি উপন্যাস

রূপ মারীচ রহস্য

ভ্রমণ সমগ্র। ভবকুঁড়ের বাইরে-দূরে

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঅনুকুলচন্দ্র ঠাকুর তব করুণ আঁখি

শ্রীমতী কণা বসু মিশ্র
করকমলেষু

আমি নিজে বৈচিত্র্যের ভক্ত। এবং বেশিরভাগ মানুষই তাই। আর করোনা প্যান্ডেমিকের যে দুঃসময় আমরা পেরোচ্ছি, তাকে সহনীয় করতে বোধহয় কিছু বৈচিত্র্য হলে ম্রিয়মাণ মন একটু অক্সিজেন পায়। এই গ্রন্থটি সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থিত নয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে এটি নানা বিচিত্র রচনার সমাবেশ। ফলে নানা রসের এক ফিউশন।

ফুটপাথের দোকান গল্পটি সাম্প্রতিক দেশ শারদীয়ায় প্রকাশিত, বাদবাকি রচনা নানা সময়ে লেখা। স্মৃতিচারণ থেকে ভ্রমণ অনেক কিছুই আছে। পাঠকের এই আয়োজন পছন্দ হবে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

২৫শে বৈশাখ
১৪২৮

সূচিপত্র

গল্প

ফুটপাথের দোকান

বুঝলেন, বিয়ের সময় আমার একটা আনক্যানি ফিলিং হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি একজন মৃতদেহকে বিয়ে করছি।

বলেন কী মশাই। এ যে সর্বনেশে কাণ্ড! তা এরকম মনে হল কেন আপনার?

সেটাই বলতে চাইছি। পাশে বেনারসিতে মোড়া যে-মেয়েটি বসে ছিল, তার শরীরে যেন কোনও সারই নেই। মাঝে মাঝে যেন ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, সম্প্রদানের সময় হাতটা ছুঁয়ে চমকে উঠেছিলাম, কোনও জ্যান্ত মানুষের শরীর কি এত ঠান্ডা হয়? তার আগে অবশ্য সাতপাক আর শুভদৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটি আমার দিকে তাকায়নি। পাশেই দাঁড়ানো এক মহিলার কাঁধে মাথা খানিকটা লটকে ছিল। মুখটা তখনও পানপাতায় ঢাকা। ভেবেছিলাম, সারা দিন উপোস আর ধকলে রোগা মেয়েটা লাতন হয়ে পড়েছে বুঝি! কুশণ্ডিকার সময় আমি অগাধ জলে। একেই বিয়ের প্রথাসিদ্ধ নার্ভাসনেস, তার ওপর একটা হিমশীতল হাত। আমারই তখন ধাত ছাড়ার উপক্রম। পারলে বিয়ের আসর ছেড়ে দৌড়ে পালাই। কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়, তাই কাঠপুতুলের মতো বসে বিয়ের মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছিলাম। সে এক প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা মশাই! শেষ অবধি কি এরা ষড়যন্ত্র করে একটা ডেডবডিকেই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছে? আমি কি কোনও ক্রিমিনাল ট্র্যাপের শিকার? এইসব আগড়মবাগড়ম ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল।

আহা, থামছেন কেন? এসব টেন্স সিচুয়েশনে গল্প থামাতে নেই। তাতে আমাদের টেনশন হয়।

না, এই একটু স্ট্রাটেজিক পজ দিচ্ছিলাম আর কী! মুশকিল হল, সাধারণত বিয়েবাড়িতে যেমন একটা হই-হুল্লোড় বা উৎসবের আবহ থাকে, আমার বিয়ের আসরটা মোটেই সেরকম নয় যেন, অনেকটা যেন শ্রাদ্ধবাড়ির মতো থমথমে। সকলের মুখই যেন গোমড়ামতো। যে-লোকটা মেয়েটিকে সম্প্রদান করতে বসেছিল, তার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন জল্লাদ। সম্পর্কে সে নাকি মেয়ের কাকা। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। ছেলেবেলাতেই আমার মা আর বাবা গত হওয়ায় আমি এর-ওর কাছে থেকে নিতান্তই অনাদরে আর তুচ্ছতাচ্ছিল্যের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছি। গার্ডিয়ান বলতে কেষ্টকাকা,তা তিনিও আপন কাকা নন, বাবার খুড়তুতো ভাই এবং লোকও সুবিধের নন। তা এই কাকা, মামা, পিসে বা মেসো নিয়ে তো আর বাছাবাছি চলে না মশাই! যার কপালে যেমন জোটে সেটাই মেনে নিতে হয়, কী বলেন!

তা তো বটেই! আমারও এক গনাকাকা আছে ফালতু লোক। কিন্তু বিজয়াদশমী বা নববর্ষে পেন্নাম না করে উপায় নেই। বাই দ্য বাই, আপনি কি বিয়ের আগে মেয়েটিকে দেখেননি?

না মশাই। আমার পোস্টিং বাঁকুড়ার মফসসলে। মেয়ে সুন্দরবনের বিজয়নগর গাঁয়ের। মেয়ে দেখার ঝক্কি ছিল বলে ফোটো দেখে মত দিয়েছিলাম। ফোটোয় আজকাল নানা জোচ্চুরি করা যায়, জানেন বোধ হয়। কেষ্টকাকা লোভী লোক। আমার বিয়ে বাবদ তিনি কনেপক্ষের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা পণ বাবদ আদায়

করেছিলেন বলেও কানাঘুষো শুনেছি। আমার বিয়ে তিনিই ঠিক করেন, আমার কিছু করার ছিল না। আমাদের বাঙালদেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, মাইনকা চিপি। শুনেছেন কথাটা?

আজ্ঞে না। চিনে ভাষার মতো শোনাচ্ছে।

মাইনকা চিপি অত্যন্ত সাব্যস্ত একটি এক্সপ্রেশন, মানুষের জীবনের গভীর জটিল সংকটের এমন লাগসই পরিভাষা আর পাবেন না। বরং শিখে রাখুন, কাজে লাগবে। তারপর যা বলছিলাম। আমি সেই বিয়ের আসরে বেশ একটা মাইনকা চিপিতে পড়ে গিয়েছিলাম।

তাই তো! এ তো মাইনকা চিপি বলেই মনে হচ্ছে! এবার আর-একটু খোলসা হোন।

এই হচ্ছি। তা নমোনমো করে বিয়েটা তো কোনওক্রমে হয়ে গেল। বাসরঘরে যে-আবহাওয়া থাকার কথা শোনা যায়, তার কিছুই ছিল না। কনের বান্ধবী বা তুতো বোনটোন কেউই নেই। বরপক্ষের দু'-একজন ছিল বটে, কিন্তু মুড ছিল না বলে তারাও মানেমানে কেটে পড়ল। তারপর মৃতদেহ বা বউ নিয়ে আমি একা। পাশেই বেনারসিতে মোড়া পুটুলিটা থুপ হয়ে বসে আছে, সাড়াশব্দ নেই, নড়াচড়া নেই।

এ তো রীতিমতো সাসপেন্স মশাই!

আজ্ঞে। কিন্তু আমি যে কত বড় বিপদে পড়েছি, তা তখনও বুঝতে বাকি ছিল। একটু পরে সাহস সঞ্চয় করে বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলাম। প্রথমে জবাব দিচ্ছিল না। তারপর কী একটু ক্ষীণকণ্ঠে বলল। গলা শুনে সন্দেহ হওয়ায় আমি নিজেই ওর ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে ভিরমি খাই আর কি!

খুব কুচ্ছিত বুঝি?

আরে না মশাই, কুচ্ছিত হলেও তো বেঁচে যেতুম। মেয়েটার বয়স মোটে বারো-তেরো বছর। কচি, নাবালিকা মেয়ে একটা! ভয়ে আমার অন্তরাত্মা ককিয়ে উঠল। আমার জেল হবে, চাকরি যাবে মানসম্মান বলতে কিছু তেমন নেই বটে, তবু যদি কিছু থেকেও থাকে তাও লোপাট হবে। মাইনকা চিপি কাকে বলে বুঝছেন তো!

ওরে বাবা, তা আর বুঝছি না! খুব বুঝছি।

কেউ যে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে তা বুঝতে পারলাম, কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর তখন সময় নেই। আতঙ্কে আমার হাত-পা শীতল, দম আটকে আসছে। একটু থিতু হয়ে মেয়েটিকে বললাম, তোমার তো বিয়ের বয়সই হয়নি! শুনে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জড়ানো গলায় যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, তার বাবা জোর করে এই বিয়ে দিয়েছে। তাকে প্রচুর মারধর করা হয়েছে, দু'দিন নির্জলা উপোস রেখে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হয়েছে। আর এর পিছনের কারণ হচ্ছে জগা।

জগা! সে আবার কে মশাই?

সে বিজয়নগর অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত। কোন কুক্ষণে মেয়েটির টুলটুলে মুখখানা দেখে তার মনে ধরে যায়, তাই মেয়েটি অর্থাৎ বনশ্রীর বাবাকে হুমকি দিয়ে রাখে যে সময়মতো সে এই মেয়েটিকে নিয়েই ঘর বাঁধবে। তাই অ্যাডভান্স বুকিং করে রাখল। খবরদার যেন বনশ্রীর বিয়ে অন্যত্র দেওয়া না-হয়! তার হুমকিকে ভয় খায় না এমন লোক ওই অঞ্চলে নেই। তবে বিয়ের কিছুদিন আগে জগা পুলিশের হাত ধরা খেয়ে তখন জেল খাটছিল, আর সেই ফাঁকে মেয়েটির গতি করার চেষ্টা করেছে, তার বাবা। সব শুনে আমি কিছুক্ষণ থম মেরে গেলাম, নাবালিকা বিবাহের অপরাধ তো আছেই, তার সঙ্গে ঘাড়ে চাপল জগা নামক এক ডাকাতের ভয়ও। লক্ষ করে থাকবেন যে সমাজবিরোধীদের সরকারবাহাদুর বেশিদিন জেলটেলে রাখতে চান না, ভালোবেসে ছেড়ে দেন বা স্থায়ীভাবে জামিনটামিন দিয়ে দেন। জগা জাতীয় লোকজন ছাড়া ওদেরও চলে না কিনা। তাই জগা জেলে আছে, এই সংবাদ আমাকে মোটেই স্বস্তি দেয়নি মশাই। আমি শুধু মেয়েটিকে জিগ্যেস করলাম, সে জগার প্রতি কতটা আসক্ত। কারণ, আজকাল বিয়ের বয়স বেঁধে দেওয়া হলেও প্রেম করার বয়স তো আর বেঁধে দেওয়া হয়নি! কী বলেন? নাবালিকা বা নাবালকদের প্রেমের

নির্লজ্জ দাপটে আমরাই বরং জড়সড়। তা মেয়েটি তখন বলল, সে জগাকে ভালো করে চেনেও না, প্রেম দূরস্থান। তবে সে পড়াশোনা করতে চায়। বিয়ে করে সংসার করার কথা ভাবেওনি কখনও। সারা রাত মেয়েটা কান্নাকাটি করল, আর আমি হা-হুতাশ। ফাঁকেফাঁকে অবশ্য মেয়েটিকে বুঝিয়ে বললাম, আমাদের বিয়েটাই বে-আইনি, কাজেই তার কোনও ভয় নেই। পরদিন তার বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলব।

তা বললেন?

যে আজ্ঞে। তবে আমি তেমন রোখাচোখা মানুষ নই, একটু মিনিমিনে। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে ভদ্রলোককে বিস্তর হেনস্থা হতে হত। বনশ্রীর বাবা কেঁদেকেটে বললেন, মেয়েটাকে জগার হাত থেকে বাঁচাতেই তাঁর এই চেষ্টা। কিন্তু এতে যে তাঁর মেয়েরও সুবিধে হল না, বরং আমার মতো একজন নির্দোষকে বিপদে ফেলা হল সেটা তাঁকে কে বোঝায়? বনশ্রীকে মুক্তি দিলাম বটে, কিন্তু আমি পার পেলাম না। লোকজানাজানি হয়ে গেল। আমাকে পুলিশে ধরল। আর সেই সুবাদে আমার ডাকঘরের কেরানির চাকরিটাও খোয়ালুম। একেবারে পথে বসার অবস্থা। মাইনকা চিপি ব্যাপারটা কি এখন একটু-একটু বুঝতে পারছেন?

আজ্ঞে পরিষ্কার বুঝতে পারছি। খুব লাগসই কথা মশাই! বলতেই হবে বাঙাল ভোকাবুলারিতে অনেক মণিমুক্তো ছড়িয়ে রয়েছে, যা এখনও এক্সপ্লোর করা হয়নি। তারপর কী হল মশাই, জেল খাটতে হল বুঝি?

হল, তবে বেশিদিনের জন্য নয়। আমাকে যে ফাঁসানো হয়েছিল, সেটা সবাই বুঝতে পারছিল। জেলখাটা তো তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, আসলে আমার কোমর ভেঙে দিয়েছিল, চাকরি যাওয়াটা। কী খাই, কোথায় মাথা গুঁজি, কার ঘাড়ে মাথা রেখে একটু কাঁদি, তার কোনও দিশাই পাচ্ছিলাম না! রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াই আর মাথা পাগল-পাগল লাগে। মুখচোরা বলে আমার বন্ধুবান্ধব ও খুব কম, আত্মীয়স্বজন বলতেও তেমন ঘনিষ্ঠ কেউই নেই। কেষ্টকাকাও গা-ঢাকা দিয়েছে। আমি তখন অগাধ জলে।

বুঝতে পেরেছি, একেই বলে মাইনকা চিপি! ওঃ লা-জবাব এক্সপ্রেশন মশাই! তারপর?

রিট্রেঞ্চমেন্টের মাস তিনেক বাদে আমি যখন গেঞ্জি আর জাঙ্গিয়ার হকারি করছি, তখন তোলাবাজ কাজুর সঙ্গে আমার চেনাজানা হয়েছিল। সে তার বসের হয়ে তোলা নিতে আসত, একটু-আধটু কথাবার্তা হত। এক বিকেলে বৃষ্টি নামায় মালপত্র গুটিয়ে পোঁটলা সামলে শেডের তলায় দাঁড়িয়ে আছি। পাশেই কাজু দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল।

হঠাৎ বলে ফেললাম, কাজু আমাকে তোদের দলে নিবি? এই উঞ্ছবৃত্তি আর পোষাচ্ছে না রে ভাই! কাজু একটা খারাপ গালগাল দেবে বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বৃষ্টিবাবদ মনটা একটু উঁড়ুউড়ু ছিল বলেই বোধ হয়, দিল না। একটু ভারিক্কে চালে বলল, মাল কামাতে চাস? তার জন্য দম লাগে। তুই কী একটা সরকারি চাকরি করতিস না? বললাম, হ্যাঁ, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে। হেসে বলল, তার মানে পেটে বিদ্যে আছে। বললাম, দূর বে, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যা শেখানো হয়, তা লোকে তাকে তুলে রেখে ভুলে যায়, ফালতু জিনিস, কাজের নয়। জিগ্যেস করল, তুই কত ক্লাস পাশ দিয়েছিস? বললাম, হিস্ট্রির এম এ, আমাকে দেখলে মনে হয়? সে একটু চুপ থেকে বলল, হয়। এক একা বুড়ো আছে, তার একজন কম্প্যানিয়ন দরকার, শিক্ষিত ছেলে চায়। সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত। বুড়োর কম্পিউটরের নলেজ নেই, সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে, আর সপ্তাহে একদিন ডাক্তারের চেম্বার আর একদিন ব্যাঙ্কে নিয়ে যেতে হবে, পারবি? বললাম, পারব, কত দেবে? কাজু বলল, টুয়েন্টি কে। রাজি থাকলে কাল সকাল আটটায় এখানে দেখা করিস। নিয়ে যাব। কিন্তু নো দু'নম্বরি, মনে থাকে যেন! বুড়ো আমার এক কাজিনের মামাশ্বশুর। বেগড়বাই করলে কিন্তু তোর খবর আছে।

রাজি হলেন নাকি?

হব না মানে! পরদিন হাজির হলাম গিয়ে বুড়োর পণ্ডিতিয়ার ফ্ল্যাটে। রমেন রায়ের বয়স আশির এপিঠ-ওপিঠ। লম্বা রোগা চেহারা, ফরসাও খুব মুখে-চোখে আভিজাত্য মকমক করছে। বউ ছিলেন রোমানিয়ান, বছর বারো আগে ডিভোর্স করে পার্মানেন্টলি দেশে ফিরে গেছেন। ছেলেপুলে নেই। ফিলোসফি আর

ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের মস্ত পণ্ডিত। দিনের খানিকটা সময় অন্তত লেখাপড়ার সংসর্গ করা যাবে ভেবে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। চাকরিটা কাজুর সুপারিশে হয়েও গেল। মনের মতো কাজ। রমেন রায় আর তাঁর গবেষণাধর্মী নিবন্ধগুলি হাতে লিখতে পারেন না, হাত ক্র্যাম্প। আমি সেগুলো কম্পিউটারে লিখে বিভিন্ন ফাইলে সেভ করে রাখতাম। উনি যেহেতু কম্পিউটরে কারেকশন করতে পারতেন না, সেই হেতু আমাকে সেসব নিবন্ধের প্রিন্ট আউট বের করে দিতে হত। সংশোধনের পর সেগুলো দেশিবিদেশি নানা জার্নালে ই-মেল করাই ছিল আসল কাজ। উনি দেখলাম আমার কাজে খুব খুশি। আর ডাক্তারের চেম্বার বা ব্যাঙ্কে যাওয়ার রুটিনওর্য়াক। তেমন পরিশ্রমও নয়। বিকেলে যথারীতি হকারিও বজায় রইল। আমার মনে হল, এর চেয়ে বড় সাকসেস আর কী-ই বা হতে পারে!

আপনি বেশ লড়িয়ে মানুষ মশাই!

আমি একা কেন, লড়াই কাকেই বা না করতে হচ্ছে বলুন! একটা পিঁপড়েকেও কত মেহনত করে চিনির দানা বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

তা অবশ্য ঠিক। মাইনকা চিপিতে আমাকেও বিস্তর পড়তে হয়েছে মশাই। তখন সেগুলোরই নাম যে মাইনকা চিপি তা জানতাম না। জীবনসংগ্রাম কাকে বলে তা আমাকেও হাড়ে হাড়ে টের পেতে হয়েছে। তারপর কী হল?

একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কি?

কী বলুন তো?

টাইম ফ্যাক্টর! সময় কিন্তু বসে ছিল না। সময় বসে থাকেও না। অনেকেই বলে বর্তমানকাল বলে নাকি কিছুই নেই, বর্তমান নাকি লজিক্যালি অসম্ভব! টেন্স নাকি মাত্র দুটো, অতীত আর ভবিষ্যৎ! সময় যেহেতু এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না, তাই নাকি বর্তমান বলেও কিছু থাকতে পারে না! সত্যি নাকি? রমেনবাবু তাই বলতেন।

থিওরেটিক্যালি তাই। তবে আমাদের সুবিধার্থে আমরা একটা ভার্চুয়াল বর্তমান কল্পনা করে নিই আর কী! নইলে ভবিষ্যৎ আর অতীতের মধ্যে কোনও গ্যাপ বা পজ নেই বলে বর্তমান বলে কিছুই দাঁড় করানো যায় না।

তাহলেই বুঝুন আমরা কত গোঁজামিল নিয়ে বেঁচে আছি! অবশ্য সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, আদতে টাইম বলে সত্যিই কিছু আছে কি না। টাইম বা সময় জিনিসটাই ঘোর বিতর্ক এবং প্রমাণসাপেক্ষ একটা জিনিস। অনেকের মতে সময় হল সোনার পাথরবাটি। তা যাই হোক, আমার সময় তখন বসে ছিল না। নিজেকে রাষ্ট্রে ও সমাজে কোনওরকম একটা আইডেন্টিটি দেওয়ার জন্য প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছিলাম। কাজটা এদেশে কত কঠিন তা বুঝতেই পারছেন বোধ হয়। ঠিক সেই সময়ে এক দুপুরবেলা ফুটপাথের ভাতের হোটেলে খেয়ে সবে নিজের ঠেকে ফিরেছি, এমন সময়ে ফোন। এবং নারীকণ্ঠ।

বলেন কী মশাই!

হ্যাঁ, আমার পুরনো ফিচার ফোনটাই আমি বরাবর চালু রেখে এসেছি, বদলানোর দরকার পড়েনি। কণ্ঠটি বলল, আমি বনশ্রী। আমাকে কি আপনার মনে আছে? সত্যি বলতে মনে ছিল না। বছর পাঁচেক আগেকার শোনা নামটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে সেকেন্ড দশেক বাদে মনে পড়ে গেল। বললাম, হ্যাঁ খুকি মনে পড়েছে। মনে হল খুকি বলাতে খুব একটা খুশি হয়নি। তার খবর জিগ্যেস করায় বলল, সে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কম্পিউটরের কোর্স করেছে এবং কলকাতায় বি এস সি পড়ছে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে। এবং বারদুয়েক যেন আমাকে শোনানোর জন্যই বলল, সে এখন উনিস ছাড়িয়ে কুড়িতে পা রেখেছে। অর্থাৎ তাকে আর খুকি মনে করার কারণ নেই।

আর জগা?

হ্যাঁ, সে কথাও হল। বলল, জগা জেলের মধ্যেই খুন হয়ে যায়। কার হাতে বা কেন তা জানা নেই। তবে শোনা গেছে পলিটিক্যাল মার্ডার।

তারপর মশাই! এ তো খুব ইন্টারেস্টিং দিকে ঘটনা টান নিচ্ছে মনে হয়।

রোমান্সের অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবলে তাই, কিন্তু অর্থনীতি এবং আর্থসামাজিক অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবুন, দেখবেন, মন রসস্থ হওয়ার বদলে উদ্বেগ এসে জায়গা দখল করেছে। আমি তখন থাকি কেষ্টকাকার পরিত্যক্ত গ্যারেজে। আগে সেখানে মনোহর ধোপার লন্ড্রি ছিল, সে মারা যাওয়ার তার ভাতিজা দখল নেয়। তার হাত থেকে গ্যারেজ উদ্ধার করতে আমাকেও হাত লাগাতে হয়েছিল, হকারবন্ধুদের মদতে। নাবালিকার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া এবং পণের টাকা গাপ করার অপরাধবোধের দরুন কেষ্টকাকা নামমাত্র ভাড়ায় থাকতে দিয়েছেন। একটু বৃষ্টিতেই গ্যারাজে জল ঢোকে, বাথরুম করতে যেতে হয় কেষ্টকাকার দোতলার বাথরুমে। রান্নাবান্নার বালাই নেই। ফুটপাথের হোটেল ভরসা। এখানে রোমান্সকে কোথায় ঢোকাবেন মশাই? তার ওপর ভদ্রস্থ চাকরি বা ব্যবসা করি না, সামাজিক পরিচয় বলতেও কিছু নেই।

তা অবিশ্যি ঠিক, কিন্তু খালপাড়ের ঝুপড়িতেও তো লোকে সংসার পাতে।

তা পাতে। কিন্তু পাতা উচিত নয়। আর আমার বেসিক প্রশ্নই তো হল, কোনও সভ্যভব্য দেশে খালধারের ঝুপড়ি বলে কিছু থাকবে কেন? মানুষকে ওই অধঃস্তরে নেমে যেতে দেওয়া হবে কোন আক্কেলে?

হ্যাঁ সেটাও ভাববার মতো কথা বটে।

আরও একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, যে-সময়ের কথা হচ্ছে, তখন বনশ্রীর যেমন উনিশ আর কুড়ির মাঝামাঝি বয়স, তেমনি আমার বয়সও তেত্রিশ আর চৌত্রিশের মাঝখানে দোল খাচ্ছে, এবং সময় থেমে থাকছে না। এত বয়ঃপার্থক্যে আজকাল দাম্পত্যসম্পর্ক হওয়ার রেওয়াজ নেই। আজকালকার মেয়েরা বুড়ো বর মোটেই পছন্দ করে না, তারা চায় সমবয়সি বর, ইয়ারবন্ধুর মতো।

সেটাই তো ভুল মশাই। আমাকে দেখুন, চল্লিশেও মোটামুটি ইয়াঙ্গিশ চেহারা রয়েছে, আমার বউয়েরও চল্লিশ, কিন্তু—থাকগে ওসব দুঃখের কথা। প্রকৃতির নিয়ম বলেও তো একটা ব্যাপার আছে না কি! তাই আপনার কথাটা মানতে পারছি না।

কথাটা বনশ্রীও মানতে চায়নি।

চায়নি? বাঃ! শুনে কান জুড়িয়ে গেল। জানেন ভাই, কান জুড়নোর মতো কথা আজকাল কানেই আসে না। তবু সারা দিন এরকম কোনও কথার জন্য কান পেতে থাকি। তা বনশ্রী বললটা কী, সেটা তো বলবেন!

ফোনে বেশি কথা হয়নি। একটু লাজুক প্রকৃতির। দেখা করতে চাইল। পরের রোববার অ্যাপো। যথারীতি একটা রেস্টুরেন্টে।

দেখতে শুনতে কেমন?

খারাপ নয়, আবার ডানাকাটা পরিও নয়। নোনা জলহাওয়ার মানুষ বলে রং চাপা। চেহারা প্রায় সেই আগের মতোই রোগা, তবে মুখশ্রী ভালো। আর একটু লম্বাও হয়েছে। জগা তো আর এমনি ঢলে পড়েনি, কিছু একটা দেখেই ঢলেছিল।

আহা, এখন জগার কথা থাক না! আপনার কথা বলুন, আপনি কতটা কাত হলেন?

শালগ্রামশিলা দেখেছেন তো। আমারও সেই অবস্থা। শোওয়া-বসা সমান। কাজেই আমার রিঅ্যাকশন নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আমার সোজা থাকাও যা, কাত হওয়াও তা।

তা বললে হবে কেন, বুকে কি আর গুড়গুড়ুনি ওঠেনি!

উঠেছিল, তবে সেটা ভয় এবং দুশ্চিন্তায়। বললাম, বিয়ে করেছ? সে ভ্রূ কুঁচকে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বলল, ও কথা কেন বলছেন? আবার বিয়ে করতে যাব কেন? আমার বিয়ে তো হয়েই গেছে, একসঙ্গে বাসররাতও তো কাটিয়েছি! প্রমাদ গুণে বললাম, ওটা কি বিয়ে নাকি? তখন তুমি নাবালিকা ছিলে, ও বিয়ে ধরতে হয় না, ওটা আইনত বিয়েই নয়। তুমি এখনও কুমারী আছ। বনশ্রী একটু রাগ করেই বলে, আইন

যেমন আছে তেমনি সংস্কারও তো আছে। জীবনটা আইন মেনে তো চলে না! আপনি আমাকে গ্রহণ করতে না চাইলে করবেন না, কিন্তু আমি নিজেকে কুমারী বলে ভাবতে পারব না। আমি সেই থেকে সিঁদুর পরি চুলে ঢাকা দিয়ে, এই দেখুন সোনায় বাঁধানো নোয়া। আর শাঁখাও ছিল, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে গিয়ে বেড়ে গেছে। তাই এখন পরছি না। মা বলছে, এওদের নোয়া থাকলেই হয়, শাঁখা না হলেও ক্ষতি নেই। আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, কিন্তু তখন তুমিই তো বিয়েটা মানতে চাওনি, এখন তবে মানছ কেন? বনশ্রী অবাক হয়ে বলে, কখন বললুম যে বিয়েটা মানি! জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম, আর জগার ভয়ও ছিল। কিন্তু বিয়েটা কখনও অস্বীকার করার কারণ তো ঘটেনি! আমরা ওরকমই নই। আমি বললাম, কীরকম নও? বনশ্রী বলে, এখনকার মতো নই, আমরা আগেকার মতো।

বাঃ! এই তো, শুনে কান জুড়িয়ে গেল।

না। আপনি বুড়িয়ে গেছেন। এসব কথা শুনে যার কান জুড়োয় সে আসলে সেকেলে বুড়ো!

নয় তাই হলুম মশাই। কিন্তু প্রাণটা ঠান্ডা হল। ঊষরতার মধ্যে একফালি ঘাসজমি দেখলে কত ভালো লাগে বলুন তো! তারপর এগোন মশাই, ধৈর্য থাকছে না যে!

একটা আর্থসামাজিক সংকটকে আপনি রোমান্টিক ননসেন্সে নামিয়ে আনতে চাইছেন তো! বুঝেছি। কিন্তু জীবনটা তো আর মিলনান্তক উপন্যাস নয়, নানারকম ঘাপলা আছে।

বনশ্রী কি আপনার বিয়ের কথা জিগ্যেস করেছিল?

করেনি আবার! খুব করেছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, বিয়ে দূরস্থান আমার খাওয়াপরার সংস্থানই নেই। শুনে মুষড়ে পড়ার বদলে বেশ খুশিই হল যেন! মেয়েটা ঘাড়ে চাপতে চাইছে ভেবে তখন আমি তাকে ঠেকানোর জন্য আমার হকারি, গ্যারাজবাস ইত্যাদি যতখানি করুণ করে বলা যায় ততখানিই বললাম। কিন্তু প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া হল না। মেয়েটা আমার দারিদ্রের করুণ কাহিনি শুনেও দিব্যি নির্বিকার হয়ে পা দোলাতে-দোলাতে আইসক্রিম খেয়ে যেতে লাগল।

আপনি কিপটে আছেন তো! মেয়েটা হা-হয়রান হয়ে পতিদর্শনে এল আর তাকে শুধু আইসক্রিম খাইয়ে ছেড়ে দিলেন!

আরে না মশাই, গরিব হলেও কিপটে নই। কী খাবে জিগ্যেস করায় নিজেই বলেছিল, চানা বাটুরা আর আইসক্রিম। বেশ তৃপ্তি করে খেল। মনে হয় খুব খিদে পেয়েছিল। তখন আমি সন্তর্পণে আমার বয়সের কথাটাও একবার তুললাম। আমি যে তার তুলনায় বেশ বুড়ো, এটা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলাম। খুব মন দিয়ে শুনলও। মুখে সিমপ্যাথিও লক্ষ করলাম। বললাম, তোমার চেহারা এত ভালো, তুমি লেখাপড়ায়ও ব্রিলিয়ান্ট, আমার মতো একজন নড়বড়ে লোককে এখনও গলায় লটকে রেখেছ কেন? সময় হলে তুমি একজন স্মার্ট, ইয়ং, ড্যাশিং পুশিং ছেলেকে বিয়ে করবে এবং সেটাই হওয়া উচিত। ওসব সিঁদুর শাঁখা কোনও কাজের নয়। ভাবলাম এবার ওষুধ ধরেছে, এতেই কাজ হবে এবং কেটে পড়বে।

কাজ হল?

হওয়া তো উচিতই ছিল। দিব্যি আইসক্রিম শেষ করে বলল, আচ্ছা, এই রেস্টুরেন্টের খাবার তো খুব ভালো, তাই না! মাঝে মাঝে তো এখানে এসে খাওয়া যায়। আপনার আপত্তি নেই তো? আমি হাঁ। এ তো আমার সঙ্গেই ঝুলে থাকতে চাইছে। আমতা আমতা করে বললাম, হ্যাঁ, তা যায়। সঙ্গে-সঙ্গে খুশি হয়ে বলল, তাহলে রোববার রোববার করে দু'জনে আসব, কেমন? শুধু এখানেই শেষ নয়, একদিন বিকেলবেলা ফুটপাথের দোকানে হকারগিরি করছি, হঠাৎ দেখি সামনে বনশ্রী সঙ্গে দু'জন বান্ধবী। বেশ বুক টান করে অহংকারের সঙ্গেই বান্ধবীদের বলল, এই দেখ, ইনিই আমার বর।

বলেন কী মশাই! বয়স যাই হোক, বনশ্রীকে আমার প্রণাম জানিয়ে দেবেন। মহীয়সী মহিলা মশাই! হাজার বছরে এক আধটা জন্মায়।

আপনি তো গদগদ হয়ে পড়লেন, কিন্তু আমার কী অবস্থা ভাবুন। দাড়ি কামানো নেই, চুল আঁচড়ানো নেই, ঘেমো শরীর। আর দু'জন আধুনিকা ঝকঝকে মেয়ে আমাকে হাঁ করে দেখছে। লজ্জায় আমি অধোবদন। তাদের একজন অবশ্য বলল, হি ইজ কোয়াইট এ ম্যাসকুলিন হি ম্যান। আর-একজনের মন্তব্য অ্যান্ড হ্যান্ডসাম অলসো!

না, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আপনার চেহারাখানা দিব্যি।

রাখুন মশাই আপনার চেহারা! আমি পড়লাম মাইনকা চিপিতে আর আপনি আমার চেহারা নিয়ে পড়লেন! এখানেই শেষ হলে তবু হত, তা নয়, এরপর প্রায়ই তার বান্ধবীরা দলবেঁধে আমাকে দেখতে আসত, আর পুরুষ বন্ধুদের উসকে দিয়েছিল যাতে তারা আমার কাছ থেকেই অন্তর্বাস ইত্যাদি কেনে, ফলে তারাও আসতে লাগল। একদিন বনশ্রীর সঙ্গে সেই রেস্টুরেন্টে খাওয়ার সময় বললাম, এসব কী হচ্ছে বনশ্রী! আমাকে লজ্জা দেওয়াই কি তোমার উদ্দেশ্য? মেয়ের তেজ আছে, উলটে চোপা করে বলল, হিস্ট্রির এম এ হয়েও আপনি যে হকারি করার সাহস দেখিয়েছেন, সেটা কি একটা উদাহরণ নয়? আপনার লজ্জা হচ্ছে কেন বলুন তো? আমার তো আপনাকে নিয়ে কোনও লজ্জা নেই।

না মশাই, আরও একবার বনশ্রীকে আমার আভূমি প্রণাম জানিয়ে দেবেন। এ ভাবা যাচ্ছে না।

দেব'খন জানিয়ে। এবার আমার কথায় আসি। আমি সাধ্যমতো সৎ ব্যবসা করি। কোয়ালিটি খুব ভালো, বাছাই জিনিস, দাম যতদূর সম্ভব কম, কেউ কিনে ফেরত দিতে চাইলে পুরো পয়সা ফেরত। তবে ফেরতের ঘটনা খুব কমই ঘটত। খদ্দেররা বাঁধা হয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং আমার ব্যবসা যে খারাপ চলছিল, তা বলা যাবে না। কিন্তু রমেনবাবুর কথা আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি! আমার পরিপাটি গোছানো কাজ দেখে উনি আমার ওপর ভারী খুশি। মাঝে মাঝে কাজ ছাড়াও গল্পটল্প করতেন। বিদেশে ওঁর ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে রোমান্সের গল্পও। আমি যে হকারি করি, তাও উনি জানতেন। কাজু ওঁকে ব্যাপারটা জানাতে বারণ করেছিল, বলেছিল, হকারি করার কথা বলিস না, ইম্প্রেশন খারাপ হবে রাখবে না তোকে। কিন্তু আমি মিথ্যে কথাটা তেমন বলতে পারি না। উনি আমাকে একদিন আমি আর কী করি জিগ্যেস করায় আমি অকপটে সব বলে দিই। উনি যে খুব একটা বিচলিত হয়েছিলেন, তা নয়। তবে বলেছিলেন, পেশা হিসেবে হকারি আইনসঙ্গত নয়। ফুটপাথ দখল করা গা-জোয়ারির মধ্যে পড়ে। উনি টিউশনিরও পক্ষপাতী নন। কারণ একই টিউশনি বিধিসম্মত কাজ নয়। দয়াপরবশ হয়ে উনি আমাকে জীবেন সেন নামে এক কর্পোরেট কর্তার কাছে পাঠান।

বাঃ! এই তো! আমি এই মোচড়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এরপরই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাওয়ার মসৃণ গল্প, তাই না?

একটা কথা মনে করিয়ে দিই, এটা কিন্তু আমার ওপরে ওঠার গল্প নয়, এটা একটা সম্পর্কের গল্প। তবে জীবেন সেন ঘোর পাগল লোক। আমাকে দেখেই বললেন, আপনি হো হকার, তাই না! ভেরি গুড! তার মানে আপনি একজন ফাইটার। আমি ফাইটার পছন্দ করি। কিন্তু ভাই, চাকরির দড়ি গলায় পরে নিলে মানুষ কেমন যেন গোরুর মতো হয়ে যায়। আর্থিক নিরাপত্তা ফাইটিং স্পিরিটের ঘোর শত্রু। লাইফের থ্রিল বলেও আর কিছুই থাকে না। বেতনভুকের জীবন বড়ই আলুনি। আজ বস আমার দিকে চেয়ে হেসেছেন, আজ অমুকে আমার স্যার বলে ডেকেছে, দুটো ইনক্রিমেন্ট হল আজ, এই সবই হল বেতনভুকের অ্যাচিভমেন্ট। আপনার কি পছন্দ হবে ব্যাপারটা? আমি কী বলব তা ভেবে পেলাম না। আমতা-আমতা করতে লাগলাম। উনি বললেন, ঠিক আছে, অ্যাজ এ জেশ্চার অফ অনার অ্যান্ড টু স্যালিউট এ ফাইটার আমি কাল থেকেই আপনার রেগুলার কাস্টমার হয়ে যাব। ওকে? আপনার স্টলের লোকেশনটা শুধু আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যান। আর আপনার ফোন নম্বরটা।

এ তো আবার মাইনকা চিপিতেই পড়লেন বোধ হয়!

আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় ছ'টা নাগাদ উনি ঠিকই এলেন এবং একগাদা গেঞ্জি জাঙ্গিয়া, রুমাল, আন্ডারপ্যান্ট, বারমুডা, টি-শার্ট, মোজা তোয়ালে ইত্যাদি কিনে নিয়ে গেলেন। প্রায় এক

সপ্তাহ বাদে অফিসে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, বড় অর্ডার পেলে জিনিসের স্ট্যান্ডার্ড আর কোয়ালিটি বজায় রাখতে পারবেন কি? আমি মুশকিলে পড়ে বললাম, দেখুন বড় অর্ডারের জন্য আমাকে সাপ্লায়ারের ওপর নির্ভর করতে হবে। আমি এখন যেরকম বাজার ঘুরে বাছাই মাল কিনি, তখন তো তা পেরে উঠব না। বড় অর্ডার পেলে সাপ্লায়ার কী জিনিস দেয়, আর অ্যাভেলিবিলিটি কতটা, তা আগে থেকে বলা মুশকিল। উনি খুব খুশি হয়ে বললেন, অকপট সত্যিকথা বলার জন্য ধন্যবাদ। তবু আপনি বড় অর্ডারই পাবেন। টেন্ডার দেওয়ার অভিজ্ঞতা বোধ হয় নেই! ঠিক আছে ওটা আমি শিখিয়ে দেব।

ওরে বাপ রে! টেন্ডার! তার মানে আপনি তো জাতে উঠে গেলেন মশাই!

আজ্ঞে, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, আমি আপনাকে কোনও অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্প শোনাতে বসিনি। আমি একটা সম্পর্কের কথা শোনাতে চাইছি। তখন বনশ্রীর সঙ্গে রোববারের রঁদেভুটা মোটমাট রেগুলার হয়ে গেছে। ওইদিন ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে আমাদের দেখা হবেই কি হবে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে রোজই ফোনে কথা বলা। প্রেমের কথা নয় মশাই। তবে নানা কথা, আগড়মবাগড়ম আর কী!

আপনি বোধ হয় জানেন না আগড়মবাগড়ম ছাড়া আর প্রেমের কোনও কথাই নেই।

তাই হবে বোধ হয়। বনশ্রীর অনেক কথার মধ্যে দিনান্তে একটা কথাই আমার মাথার মধ্যে ভোমরার মতো টক্কর খেয়ে-খেয়ে ঘুরে বেড়াত, অত ভাবছেন কেন, আমি তো আছি!

না মশাই, আমি বোধ হয় আহ্লাদে হার্টফেল করে বসব। তবু বলবেন এসব প্রেমভালোবাসার কথা নয়?

আগে শুনুন। সেই রোববার আমি জীবন সেনের প্রস্তাবের কথাটা বলতেই বনশ্রী বলল, আপনি কিন্তু চট করে বড়মানুষ হওয়ার কথা ভাববেন না। আপনি যেমন আছেন তেমন থাকলেই আমাদের চলবে। যদি তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে যায়, তাহলে তো হবে না। আমার হঠাৎ একটা দুষ্টুবুদ্ধি জেগে ওঠায় বললাম, আমার পা পিছলে গেলে তুমি কি আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে? একটু ভেবেচিন্তে বলল, না, আমি কোনও অবস্থাতেই আপনাকে ছেড়ে পালাব না। আপনি জগা ডাকাত হয়ে গেলেও না। তবে পরের জন্মে হয়তো আমি আর আপনার বউ হতে চাইব না। শুনে কী জানি কেন বুকটা ধক করে উঠল। মৃদু হেসে বললাম, কিন্তু ইহজন্মেই তো আমরা এখনও কেউ কারও কিছু নেই। বনশ্রী বলল, আপনাকে কারও কিছু হতে হবে না। কিন্তু আপনার যে খুদকুঁড়োটুকু আছে তার মধ্যে আমাকেও ধরে নেবেন, তাহলেই হবে। আপনার কত টাকা হল সেটা বড় কথা নয়, ক'টা মানুষ আপনার হল সেটাই বড় কথা।

নাঃ হার্টটা বোধ হয় এইমাত্র ফেল হয়ে গেল!

খুব যদি অসুবিধে না হয়, তাহলে আরও তিন মিনিট বেঁচে থাকুন। লাটাই গুটিয়ে এনেছি।

তথাস্তু।

খুব ধীরে-ধীরে যখন আমার সুসময় আসতে লেগেছে তখন একদিন বনশ্রী বলল, সুসময় কিন্তু মানুষের পতনেরও সময়। আপনার চোখেমুখে একটু দিশাহারা আনন্দের ভাব দেখছি, আমার ভয় হচ্ছে। আপনাকে সামাল দেওয়া দরকার। এখন কি আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি? একটু ভেবে বললাম, কেন নয়? কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার তো এখনও আইনমোতাবেক বিয়েটাই হয়নি! সে ঝংকার দিয়ে বলল, আপনি আইন কোলে করে বসে থাকুন, কিন্তু আমাকে সংসারটা করতে দিন।

দিলেন তো?

তা দিলাম। একদিন বলল, আপনি ফুটপাথের দোকানটা কিন্তু তুলে দিতে পারবেন না। মাঝে মাঝে আপনাকে হকারিও করতে হবে। অবাক হয়ে বললাম, কেন? সে বলল, তাতে আপনার বুদ্ধিবিভ্রম হবে না, মন ভালো হবে আর মাটিতে পা থাকবে। মনে-মনে একটু বিরক্ত হলাম ঠিকই, কিন্তু ভিতরে একটা ভয় যেন কবে থেকে ঢুকে বসে আছে, বনশ্রী যদি কোনও কারণে পরজন্মে আমার বউ হতে না চায়! তাই রাজি হতে হল।

অবাক করলেন মশাই! কোটিপতি হয়েও এখনও আপনি মাঝে মাঝে হকারি করেন নাকি?

কী করি বলুন, ওই একটাই যে ভয়, পরজন্মে যদি...

মায়াবী নিষাদ

অল্প কিছুদিন আগে একটি মাসিক পত্রিকায় বিমল কর তাঁর কয়েকজন তরুণ লেখক-বন্ধু এবং নিজেকে নিয়ে একটি স্মৃতিকথা লেখা শুরু করেছিলেন। সেটা আত্মজীবনী নয়, আবার তরুণ লেখকদের সাহিত্যের বিচার বা মূল্যায়নও নয়। সেটা স্মৃতিকথাই। বিমল কর তাঁর স্মৃতিকথা লিখছেন এটা জেনে অনেকেই হয়তো বিস্মিত হবেন, ভেবে দেখবেন এটা কোন সাল এবং এই সালে কার কত বয়স হল। কেননা লোকে স্মৃতিকথা লেখে বয়সের এমন একটি চূড়ায় এসে, যেখান থেকে গড়ানে অতীতটাকে দেখা যায় ঢালু হয়ে নীচে সবুজ একটা উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। বয়সের রঙে ধূসর বর্ণ এসে গেলে মানুষ তখন সবুজ উপত্যকার গল্প শোনাতে বসে যায়। বিমল কর কি সেই চূড়া স্পর্শ করলেন? অথচ এই তো সেদিন বাঙলা ছোট গল্পের আসর তোলপাড় করে নামলেন বিমল কর, এখনো সবুজ বিদ্যুৎ চমকে উঠছে তার লেখায়, তবু স্মৃতিকথা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কারো কারো মনে পড়তে পারে যে তিনি কিছুদিন আগেই একটি গল্প লিখেছেন—'সংশয়'। বিষয়বস্তু, কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর এক ভদ্রলোক ফিরলেন বিদায়-অভিনন্দনে-পাওয়া একরাশ জিনিসপত্রের উপহার নিয়ে। সেইসব উপহারের মধ্যে ছিল একখানা অদ্ভুত সুন্দর দেয়াল-ঘড়িও। গল্পের শেষে দেখা যায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙেছে প্রবীণ দম্পতির দেয়াল-ঘড়ির ছোট পাখিটা আটকে গেছে একটা ঘরে আর নড়ছে না, সময় থেমে আসছে দুজনেরই জীবনে। অসহনীয় সেই মাঝরাতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে আকুল প্রশ্ন তোলপাড় করে ওঠে—সর্বশেষ বিদায়ের দিনে তাঁরা পরস্পরকে কী দেবেন! কোন সে উপহার? প্রশ্নের উত্তর গল্পের মধ্যে ছিল না। অন্তর্মুখী বিমল কর হয়তো এর উত্তর এখনো খুঁজে পাননি, কেবল প্রশ্নটিকেই পেয়েছেন। ইদানীং তাঁর লেখায় মাঝে মধ্যে এরকম প্রশ্ন এসে যায়। মনোযোগী পাঠক সামান্য বিস্মিত হয়ে ভাবে—কার কত বয়স হল! তবু বয়সের দিক থেকে বিমল করকে প্রবীণ বলা যায় না। পঞ্চাশের ঘর এখনো স্পর্শ করেননি, এখনো বাঙলাদেশে তাঁর সেইসব পূর্ব সুরীরা আসর জমিয়ে রেখেছেন, যাঁরা সস্নেহ হাস্যে বলতে পারেন—বিমল! বিমল তো ছেলেমানুষ!' সাহিত্যের আসরে, সভায়, পত্রিকার অফিসে সেইসব পূর্বসূরীদের সঙ্গে দেখা হয়। বিমল কর জ্যেষ্ঠের মর্যাদা দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, মাথা নীচু করে বিনীত হয়ে কথা বলেন, সলজ্জ হাসেন। তাঁকে ছেলেমানুষের মতোই দেখায়। তাঁর মাথায় একরাশ কালো চুল, দীর্ঘ শীর্ণ শরীরে বার্ধক্যের কোনো কুঞ্চন লক্ষ্য করা যায় না, এখনো তিনি হাসি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেননি, আপাত-গম্ভীরে বিমল কর হাসির কারণ ঘটলে হেসে বেদম হয়ে পড়েন এখনো। বিমল কর প্রবীণ যা সমবয়স্কদের সঙ্গে ঠিকমতো মিশ খেলেন না এখনো, তাঁর প্রিয় সঙ্গী এবং বন্ধু সেইসব তরুণ অখ্যাত লেখকেরা যাঁদের সঙ্গে নিজের কথা মিশিয়ে তিনি তাঁর স্মৃতিকথা লেখা শুরু করেছেন। তাই তাঁকে সঠিক প্রবীণ বলা যায় না। হয়তো এ কথাই

ঠিক যে অনেক সময়েই লেখকের সঙ্গে তাঁর লেখার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। যে বিমল কর আড্ডা মারেন হাসেন, কথা বলেন, আর যিনি 'পূর্ণ অপূর্ণ' লেখেন তাঁর হয়তো আলাদা।

যতদূর মনে পড়ে বিমল করের প্রথম গল্প পড়েছিলাম 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি'। কোনো শারদীয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল। তখন আমার বয়ঃসন্ধি। গল্পের নায়িকা চন্দনার বিয়ে হচ্ছে না, দিদির বাড়িতে দূর প্রবাসে রয়েছে সে। বিয়ের যোগাযোগের জন্যই সেখানে রাখা হয়েছে তাকে। ফাঁকা নিঃঝুম বাংলো বাড়িটার সুন্দর সব জিনিসপত্র, কেতাদূরস্ত চাল চলনের মধ্যে সে ক্রমশ হাঁফিয়ে উঠছে। মুক্তি নেই। এইটুকুই গল্প। যার মধ্যে সত্যিকারের গল্প কিছু নেই, কেবল আছে ছবির পর ছবি, প্রবল প্যাশনেট পরিবেশ-বর্ণনা, টুকরো টাকরা স্মৃতির সঙ্গে কখনো বা পাখির ডাক, কখনো দুপুরের নির্জনতার সামান্য একটু প্রাকৃতিক বর্ণনা। তবু চন্দনার জন্য বড় উদ্বেগ বোধ করলাম। স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী বাসা নিল চন্দনা, আমার অনেক নিঃসঙ্গ দুপুর কেটেছে কল্পনায় চন্দনার দিদির সেই নির্জন বাংলো বাড়ির আনাচে কানাচে—হাতে হাত রেখে। তখনকার তরুণ লেখক বিমল কর একজন পাঠক পেলেন। বাঁধা পাঠক। আত্মজা, উদ্ভিদ, আঙুরলতা সেই পাঠককে ক্রমপরিণত এবং আরো মনোযোগী করে তুলল। অপরিচিত বিমল করের যে চেহারা কল্পনায় আসত তা ছিল —গৌর বর্ণ, নাতিদীর্ঘ, সুপুরুষ উজ্জ্বল মুখ চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। অনেক সময়ে যেমন লেখকের সঙ্গে তাঁর লেখার মিল খুঁজে পাওয়া যান না, তেমনি পাঠকের কল্পিত লেখকের চেহারাও আসল চেহারার সঙ্গে কদাচিৎ মেলে। 'পার্ক রোডের সেই বাড়ি' গল্প পড়বার প্রায় চার পাঁচ বছর পর সাহিত্য-মশলিপ্সায় আক্রান্ত হয়ে 'দেশ' পত্রিকায় গল্প জমা দিতে গিয়ে বিমল করকে প্রথম দেখি। হতাশ হই। দীর্ঘ শীর্ণ চেহারা, রঙ শ্যাম, যাকে লাবণ্য বলে তা তাঁর চেহারার ছিল না। বরং শুষ্ক রুক্ষ একটা চেহারায় প্রথম দেখলাম। কিছুদিন আগেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল, কামানো মাথার সদ্য খোঁচা খোঁচা চুল উঠেছে। শোক এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য তাঁর চার পাশে আমার মতো হঠকারী তরুণ যশঃপ্রার্থীর প্রায়-অগম্য একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে রেখেছিল। কখনো মনে হয় না যে ইনি 'পলাশ' কিংবা 'কাচঘরে'র লেখক। সেইসব গল্পের পেলব, কুসুম-কোমল শব্দ-চয়ন, বাক্য গঠনে ললিত-ভাস্কর্য—যা আমাকে পাঠক হিসেবে মনে মনে তাঁর নিকটবর্তী করেছিল, বাস্তব লোকটিকে ঠিক ততখানি দূরবর্তী মনে হয়েছিল যখন তিনি টেবিলের ও-পাশ থেকে মাথা তুলে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন—'কী চাই?' আমার আত্মপরিচয় দেওয়ার কিছু ছিল না—তখন আমার মাত্র বাইশ বছর বয়স, মফসসলের গন্ধ তখনো আমার গায়ে, কল্পনার জগতে বসত। দুঃখ হয়েছিল—হায় ঈশ্বর, বিমল কর আমাকে চেনেন না? আমি যে তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রের নিত্যসঙ্গী, অনেকবার তিনি আমার কিশোর মনে মায়া-বিষণ্ণতা সঞ্চার করে দিয়েছেন, আমি তো সেই পাঠক যার জন্য বিমল কর লেখেন। দুপুরের খর-রোদে 'দেশ' অফিস থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছি—ইনি বিমল কর হতে পারেন। হয়তো ইনিই যথার্থ বিমল কর। তবু আমার কল্পনার বিমল করও নিশ্চিত আছেন কোথাও। সেই গৌর, উজ্জ্বল মুখ নাতিদীর্ঘ স্মিতহাস্যের বিমল কর—যিনি আমার জন্য লেখেন, যাঁকে আমি চিনি, যিনি আমাকে দেখলেই সমাদরে বলে উঠবেন—এই যে কী খবর? সেই বিমল করের সঙ্গে আমার অপরিচয়ের কোনো দূরত্ব নেই। তাই সত্যিকারের বিমল করকে আমি অপছন্দ করলাম। সেটা আরো বেড়ে গেল যখন তিনি আমার গল্প ফেরত দিলেন না-হেসে একটিও কথা না বলে। পর পর দুবার।

দুবার নাকচ হওয়ার পর বিমল করের প্রতি আমার অপছন্দের ভাব হয়তো বেড়েছিল। আর ঠিক সেই সময়ে তিনি লিখলেন 'সুধাময়', 'আর এক জন্ম অন্য মৃত্যু' ; সে সময়ে তাঁর একটি উপন্যাসও আমি পড়ে ফেললাম—'ফানুসের আয়ু'। বাস্তবে যাকে রূঢ় মনে হয়েছিল, সেই লাবণ্যহীন বিমল কর আবার স্বভাবসিদ্ধ মায়াবিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করলেন আমাকে, আমার মধ্যে অপরাহ্নের ম্লান দীর্ঘ বেলার দৃশ্য ফুটে উঠল, সেই শেষ বেলায় দেখা যায় নিঃসঙ্গ গির্জার চূড়ায় নিথর ক্রস দূরে রেল লাইন, তীর্থপতির মৃতদেহ পড়ে আছে, কখনো বা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে রোগে জীর্ণ পাণ্ডুর একটি মেয়ের মুখ যাকে ভালোবেসে ছিল সুধাময়, কখনো বা প্রত্যক্ষ করি সেই লোকটাকে যে গাধার পিঠে চড়ে টাকার থলি হাতে বেরিয়েছে মানুষের আত্মা

কিনবার জন্য। পত্রিকা-অফিসের বিমল করকে ভুলতে সময় লাগল না। নাকচ লেখক হতে পারি, কিন্তু সন্দেহ নেই যে আমি ছিলুম তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মনোনীত পরিবারের একজন—যাদের জন্য তিনি লেখেন। তখন তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক আর দূরের মানুষ।

দূরত্বটা খুব বেশিদিন রইল না। ঘটনাক্রমে আমি তাঁর নিকটবর্তী হতে পেরেছিলাম। আগেই বলেছি তাঁর পরিমণ্ডলে ছিল কয়েকজন তরুণ অখ্যাত লেখক! তিনি তাঁর সেই সতেজ, প্রাণ-প্রচুর সঙ্গীদের মধ্যেই সবচেয়ে সহজ বোধ করতেন। সেইখানে সহজ একটি মানুষকে খুঁজে পাওয়া গেল। কোমলপ্রাণ, সৎ, বন্ধুবৎসল, অমিতব্যায়ী। তিনি ডেকে নিলেন সেইখানে আমাকে। তৃতীয় বিমল করের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। পুরোনো দুটো ছবি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেল। দেখলাম সহজ এবং বিনয়ী মানুষ অতিশয় ভদ্রলোক। জ্যেষ্ঠ সাহিত্যকের উপযুক্ত মর্যাদা কনিষ্ঠদের কাছ থেকে আদায় করতে একেবারেই সচেষ্ট নন, সবচেয়ে বড় কথা কখনো কাউকে উপদেশ দেন না। 'নিষাদ' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন সেই সময়ে। অতি জটিল গল্প—মর্মভেদী। মনে প্রশ্ন এসেছিল আমার—অতি সহজ এই মানুষটি কি করে অত জটিল গল্প লিখলেন? বাচ্চা একটি ছেলে সারাদিন রেল লাইনের ওপর আক্রোশবশত ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছে। কারণ রেলগাড়িতে কাটা পরে মরেছে তার প্রিয় ছাগলছানাটি। গল্পের প্রথম পংক্তিতে ভবিষ্যদবাণীর মতো পরিণতির আভাস দেওয়া—ছেলেটি মরবে। ধূয়োর মতো ঘুরে ঘুরে এসেছে পংক্তিটি। বাচ্চা একরোখা একটি ছেলে তার প্রিয় গৃহপালিত পশুটির হন্তা সেই নিষ্প্রাণ কঠিন রেললাইনের ওপর নিষ্ফল আঘাত করে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে বিপজ্জন রেললাইনের কাছাকাছি। অথচ ছাগলছানাটির হত্যাকারী ছিল ভিন্নজন—ছেলেটির সাধ্য ছিল না সেই চক্রান্ত ভেদ করে। তাই নিয়তিই টেনে নিল তাকে। অসামান্য ছিল গল্পের শেষাংশে, একটি বর্ণনা যেখানে শেষ বেলায় চারদিকে মাঠঘাটে ছায়া পড়েছে। তবু সামান্য একটু রোদ অপেক্ষা করছে সেই জায়গাটাকে চিহ্নিত করার জন্য যেখানে কাটা পড়েছে প্রতিশোধকামী শিশুটি। তুচ্ছ ঘটনাটুকুকে লণ্ঠনের মতো তুলে ধরে তিনি—ছোট গল্পে যতখানি সম্ভব—ততখানি নিয়তির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ দেখিয়েছিলেন।

'দেওয়াল' উপন্যাসের দুটি খণ্ড তখন বেরিয়েছে। পাঠকরা প্রকাশকের দরজায় হানা দিচ্ছেন—তৃতীয় খণ্ড কবে বেরোবে? এখানে সেখানে দেওয়াল নিয়ে আলোচনা শুনি। তখনো পড়া হয়নি। পড়লাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতার পটভূমিকায় বাংলায় বোধ হয় আর কোনো উপন্যাস কেউ লেখেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমি শিশু ছিলাম। তখনকার উদ্বেগ অশান্তি ভয়, আমার অস্তিত্বকে তেমন আলোড়িত করেনি। খুব উজ্জ্বল নয় তখনকার স্মৃতি। তবু মনে পড়ে—আকাশে ঝাঁক ঝাঁক এরোপ্লেন উড়তে দেখেছি, সাইরেনের শব্দে খেলা ভুলে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছি, দেখেছি রাস্তায় ঘাটে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে। বিহারের একটা রেলশহরে মিলিটারি স্পেশাল ট্রেনে গোরাদের লাল মুখ দেখে ভয় পেয়েছি, কুড়িয়ে এনেছি তাদের ছুঁড়ে দেওয়া বিস্বাদ বিস্কুটের প্যাকেট। আজ কেরোসিন, কাল দেশলাই উধাও হয়ে যাচ্ছে বাজার থেকে। বাবার মিলিটারিতে অপশন দেওয়া ছিল। ইউনিফর্ম পরে বাবা যেতেন প্যারেড করতে, হাতে থাকত, চামড়ায় বাঁধানো ছোট্ট একটা ছড়ি। হুইশল সমেত একটা মিলিটারি পোশাক তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল আমাকে। বিহারের সেই শহরে যে রেলবাংলোয় আমরা থাকতাম তার পাশের বাড়িটাতেই ছিল মিলিটারি অফিসারদের আস্তানা। অ্যামেরিকান মিলিটারি। কোনোদিন হয়তো আমার দাদু কিংবা অন্য কেউ গ্রীষ্মকালে বাগানে বসে পাখা নাড়তে নাড়তে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করেছিলেন—উঃ, বড় গরম। তার পরদিন সাহেবদের আস্তানা থেকেও অনুরুপ ঘোষণা শোনা যেতে লাগল, খালি গায়ে খোলা বাগানে বসে সাহেবরা চেঁচাচ্ছে—বড় গরম, বড় গরম। তখন প্রায় বাড়িতে আলোচনা শুনতাম যুদ্ধে সাপ্লাই দিয়ে কেউ কেউ অবস্থা ফিরিয়ে ফেলছে। বুঝতে পারতাম যুদ্ধ না থামলে মানুষের সুদিন আসবে না। দাদু তখন আমাকে পত্রিকা পড়তে শিখিয়ে ছিলেন। সেই শৈশবের যুদ্ধের স্মৃতি বড় হয়ে আর খুব উজ্জ্বল ছিল না, আমার কাছে। 'দেওয়াল' পড়তে পড়তে সেই স্মৃতি জাতিস্মরের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার। বিমল করের লেখার একটা নিজস্ব ধাঁচ আছে। তাঁর

ভাষা স্পর্শকাতর, কোমল, শব্দ ব্যবহারে তিনি অতিশয় সতর্ক—অনেক শব্দ তিনি পরিহার করে চলেন, অন্ত্যজ জ্ঞানে, রোম্যান্টিক বিষাদময়তা তাঁর ভাষায় স্বভোৎসারিত। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক ভাষা 'দেওয়াল' রচনায় ব্যবহৃত হয়নি। বাসু এবং তার পরিবেশ, তার স্বজন আপনদের নিয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তেরর সংসার এবং যুদ্ধের কলকাতা—এই সবকিছুকেই অতিবাস্তব তন্ময়তা দিয়ে চিত্রিত করেছেন বিমল কর। হুবহু ব্যবহার করেছেন সেই সব ভাষা যা সাধারণ দুঃখী মানুষেরা রাগ, ক্ষোভ, অধৈর্য এবং হতাশার সময়ে ব্যবহার করে। এই বিচিত্র উপন্যাসটিতে বিমল কর তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ মায়া-বিষাদে আচ্ছন্ন করেননি আমাকে। বরং হুবহু সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলকাতায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার শ্রুতি এবং স্মৃতির সাক্ষ্য নির্ভরশীল হলে বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে বাংলা দেশে তার মধ্যে 'দেওয়াল' সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ এবং প্রামাণ্য উপন্যাস। উপন্যাসটির বিন্যাস বা রূপকর্মে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো চমক ছিল না, যেমন ছিল 'খোয়াই' উপন্যাসে। তবু বিমল করকে তাঁর 'দেওয়াল' উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করবে।

তাঁর প্রথম লেখা যখন পড়েছিলাম তখন থেকেই জানতাম বিমল কর নতুন রকমের কিছু লেখেন—যা তাঁর আগে আর কেউ লেখেনি। পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে এবং ষাটের শুরুতে বিমল কর এমন কিছু লেখা লিখেছিলেন যা-তার স্বভাবসিদ্ধ আধুনিকতার মধ্যেও অভিনবত্ব এনেছিল। আর এক জন্ম, অন্য মৃত্যু 'নিষাদ' 'টেলিগ্রাম' কিংবা এই দেহ, অন্য মুখ'—এই সব ছোটো গল্পগুলি। যতদূরে জানি সে সময়ে তিনি দেওয়ালের তৃতীয় খণ্ড লিখছেন। তা ছাড়া অন্য উপন্যাসের পরিকল্পনা তাঁর কাছে শুনিনি। বরং ছোটো গল্পই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। ছোটো গল্পই তিনি সবচেয়ে সহজে আত্মপ্রকাশ করছিলেন তখনও। যে সময়ে কিছু তরুণ লেখক বাংলা গল্পে খাত-বদলের চেষ্টা করছিলেন। মানুষের চারদিকে যেমন একটা বাইরের জগৎ রয়েছে। ঠিক তেমনই বিপুল একটা জগৎ রয়েছে। তার ভিতরেও। বাইরের জগতের কথাই হচ্ছে নিছক গল্প, আর ভিতরের কথা মনন। এ সময়ে গল্পকারদের গল্পে এই ভিতরের জগতের কথা প্রকট হয়ে উঠছিল। পাঠকমহলে শোরগোল শোনা গেল—গল্প কই? কিছু বয়স্ক লেখকও এই ব্যাপারে স-প্রশ্ন হয়েছিলেন। তরুণদের একটি গল্প-সঙ্কলন বিমল করের সম্পাদনায় এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আর এই সময়ে সম্পাদনা করেছিলেন একটি অভিনব পত্রিকা—'ছোটো গল্প, নতুন রীতি'। তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখক, সুতরাং ইচ্ছে করলে এই ব্যাপারে সে সময়ে যে বাদানুবাদ এবং বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। এড়াননি—তার কারণ, জ্যেষ্ঠ এবং প্রতির্ষ্ঠিত হয়েও সনাতন বিরাগী বিমল কর এই সব তরুণদের সমধার্মিতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই বিতর্কের ঠিক মাঝখানে তাঁর মাথাটিই সবচেয়ে উঁচু হয়ে উঠল, ফলে অর্বাচীন তরুণ লেখকদের মুখপাত্র বলে সমালোচনা এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি সহ্য করতে হয়। তিনি তা শান্তভাবেই সহ্য করেছিলেন। ধারা-বদলের কিংবা নতুন একটা রীতির প্রবর্তনের তীব্র ইচ্ছাতেই যে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা নয়। বরং এর মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল। তৎকালীন তরুণ লেখকেরা কিংবা বিমল কর—কেউ চাননি বাংলা গল্পের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চনা করতে। বিদ্রোহ তাঁদের কারোরই অভিপ্রেত ছিল না বোধ হয়। তবু তাঁরা পুরোনো রীতি, প্রকরণ, বিন্যাস এবং বিষয় ত্যাগ করতে চাইছিলেন—বহির্মুখীনতার চেয়ে তাঁদের কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর। তাই তাঁদের লেখায় স্ব-কৃত আত্মপ্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটছিল বারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস, চেতনামগ্ন ভাবপ্রবাহে তির্যক কিংবা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সমাজ এবং বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী (মানুষের ভিতরে অতি জটিল সূত্রে অন্তর এবং বাহির গ্রথিত হয়—স্বপ্নে এবং চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ ঘটে। যে সময়ে বিমল কর স্বোপার্জিত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পরিমাণে তৃপ্ত হয়ে নিজেকে পরিণত ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি তরুণদের আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে আর তরফা পরীক্ষা-নিরক্ষায় মেতে উঠলেন। তাঁর লেখায় অন্তর-উন্মোচনের নূতনতর প্রয়াস দেখা যেতে লাগল। 'মানবপুত্র' লেখা হয়ে গিয়েছিল। নতুন

লিখলেন 'দরজা, 'উদ্বেগ, ত্রিলোচন নন্দীর নামে ছড়া, আরো পরে লিখলেন 'সোপান', 'জননী', 'অপেক্ষা'। শান্তি কাব্যময়তায় স্নিগ্ধ পদবিন্যাসে পবিত্রতার আভাষ-মণ্ডিত ভাষায় লেখা এই সব গল্প কিন্তু অন্তর্নিহিত তীব্র, চঞ্চল, আশ্রয়, ভিখারি, এক অসহায় যন্ত্রণা, অমোঘ মৃত্যু, চেতনার দাহ, নবীনতর বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বিকল্প-সন্ধান, গল্পগুলিকে এক ধরনের আশ্চর্য গতিবেগ দিয়েছিল। এই গল্পগুলি ততখানি বাস্তব যতখানি বাস্তব মানুষের রহস্যবৃত অন্তর এবং তার জটিলতা। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে যদি বিমল করের এইসব গল্প নিয়ে গবেষণা হয়, তখন তুলনা দেওয়ার দরকার হলে ঠিক বিমল করের সমধর্মী গল্পের অনুসন্ধান তাঁর পূর্বসুরীদের লেখায় করলে গবেষক ব্যর্থ হবেন। লেখক জীবনের শুরুতে 'আত্মজা' এবং 'উদ্ভিদ' লিখে তিনি মতবিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন। পরিণত জীবনে তাঁর নতুন গল্পগুলো আবার বিতর্কিত হতে লাগল। পাঠক এই গল্পগুলিকে কী বলবেন! ভালো? না, মন্দ? ও দুটি শব্দের কোনোটিই নিশ্চিত ভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছিল না। শুধু বোঝা গেল যে লেখাগুলো খুবই নতুন ধরনের।'

যদিও গল্প নিয়েই বিমল করকে বেশি ব্যস্ত দেখেছি, তবু ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েকখানা উপন্যাসও লিখেছেন। কেরানীপাড়ার কাব্য উপন্যাসে তিনি নতুন একটি প্রকরণ নিয়েছিলেন—গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত—এরকম পর্যায়ে ভাগ করে গোটা একটি কেরানী পাড়ার চলমান চিত্র। নায়ক বলতে বস্তুতঃ কেউ ছিল না, গোটা, কেরানী পাড়াই সেই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। 'বনভূমি কিংবা 'জীবনায়ন'—সর্বত্রই তাঁর রীতি ও প্রকরণে কিছু নতুন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

সম্ভবতঃ 'সোপান' 'জননী' 'অপেক্ষা' লিখতে লিখতে বিমল কর চল্লিশ পার হয়ে গেলেন। সাহিত্যের কৃতিত্ব বিচারে বয়সটা হয়তো তেমন বিচার্য কিছু নয়। তবু উল্লেখ করলাম,—কারণ এই সময় থেকেই বিমল করের লেখায় এক রকমের পরিবর্তন এল। সেটা বয়সের জন্য কি না কে জানে। বরাবরই প্রেম তাঁর প্রিয় বিষয়। 'উদ্ভিদ' 'পলাশ' কিংবা 'জানোয়ার' গল্পের প্রেম কখনো বিকৃত ভয়ঙ্করতার কখনো ফ্রয়েডার তত্ত্বের ব্যাখ্যার, কখনো বা বিষণ্ণ শুদ্ধতার অমল লাবণ্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। অন্যদিকে তার লেখায় এতকাল ঈশ্বর-চেতনা খুব প্রবল ছিল না। 'পিতৃঘ্ন' গল্পের নায়ক স্বকৃত পাপের স্বীকারোক্তির সময়ে ভুলে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে পরমুহূর্তেই ভ্রম সংশোধন করে বলেছে, 'ঈশ্বর' শব্দটি কথার কথা মাত্র। তদুপরি বিমল কর জীবনের সর্বত্র নিয়তির অমোঘতাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, মৃত্যুচিন্তায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। ব্যক্তি মানুষটি, বিষন্নতা আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে। এ চিন্তা সব মানুষেরই, এ বোধ সকলের মধ্যে অল্প বিস্তর রয়েছে। তবু কোনো কোনো মানুষ—অনুভূতি যাঁদের মধ্যে প্রবল, যাঁরা সহজে প্রতিক্রিয়ায় আহত হন—তাঁরা আক্রান্ত হন আরো বেশি, বিষাদ রোগ সারাজীবন তাঁদের সঙ্গী হয়ে থাকে। বিমল করের এতকালের সব লেখার মধ্যেই কোনো না কোনো ভাবে এই অনুভূতিগুলোই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাধান কিংবা সান্ত্বনা কোনোটাই তাঁর লেখায় ছিল না। নিজ অন্তরের যন্ত্রণাকে তিনি নির্মমভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। ঈশ্বর কিংবা প্রেম—কোনোটাকেই তিনি এই যন্ত্রণার প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করেননি। তাঁর প্রেমের গল্পেও বিষণ্ণতা, তাঁর ঈশ্বরপ্রসঙ্গেও অবিশ্বাস কোনোটাকেই তিনি ঢেকে রাখেননি। কিন্তু সম্ভবতঃ চল্লিশের পর বিমল কর আত্মস্থ একটি মগ্নতাকেই চেষ্টা করছিলেন আবিষ্কার করতে। নিজের অন্তরকে উন্মোচন করে করে সম্ভবত তিনি এক উদ্দেশ্যহীন নিয়তি-নির্দিষ্ট শুন্যতাকে অনুভব করেছিলেন ব্যক্ত জগৎ ও জীবনে। অথচ শূন্যবাদ কিংবা দুঃখবাদ বোধ হয় কোনোদিনই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কেননা এই বোধ তাঁকে আবাল্য কষ্ট দিয়েছে, হরণ করেছে জীবনীশক্তি, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মধ্যাহ্নে সঞ্চার করেছে ক্লান্তি ও অবসাদ। জীবনের কেন্দ্রবিন্দু কোথায়? কোন মঙ্গল, কোন আদর্শ, কোন প্রীতি থেকে শুরু হচ্ছে জীবন? শেষ হচ্ছে কোন পূর্ণতায়? প্রবল আত্মমুখী হয়েও নিজের মধ্যে থেকে যাচ্ছে কেন রহস্যময়তা?

আবার অনুসন্ধান শুরু হল। এবার আশ্রয়ের সন্ধানে বাসা বাঁধবার প্রয়োজনে খড়কুটোর খোঁজে তিনি ফিরে গেলেন কৈশোরে, বয়ঃসন্ধিতে। অমল এবং ভ্রমর যেন তাঁরই দুটি সত্তা। নিজেকে দুভাগ করে বিমল কর পিপাসার্ত চিত্তে সেই অমল বিশুদ্ধ প্রেমে আকণ্ঠ পূর্ণ করলেন নিজেকে, ভ্রমর হয়ে। উপন্যাসের মধ্যে সুস্পষ্ট

হয়ে প্রকাশ পেল তাঁর ঈশ্বরভাবনা, ধর্মবোধ। এই ভাবনা এবং বোধ অবলম্বন করল খ্রীষ্টকে। অত্যন্ত সহজ এবং সরল গল্প—কাহিনি-প্রধান, মনোবিকলন নেই, আত্মবিশ্লেষণ নেই, যন্ত্রণা, অস্থিরতার পরিণাম নেয়নি কোথাও। মৃত্যুর ইঙ্গিতে শেষ হচ্ছে উপন্যাস, তবু তার রসাবেদন শান্ত, কেননা সেখানে প্রেম ও ঈশ্বর হয়েছেন পরস্পরের নিকটবর্তী। পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হয়, অসহায় মানুষের সেই সনাতন সান্ত্বনার ভূমিতেই যেন ফিরে এলেন তিনি। আত্মাবিষ্কার পূর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু তবু বোধ হয় আরো কিছু অপূর্ণ রয়ে গেল। কৈশোরের প্রেম ঈশ্বরের সামীপ্যে যেতে পারে, তার সেই বিশুদ্ধতা আছে! কিন্তু পরিণত মানুষের? যে মানুষের জীবনে পৃথিবীর পঙ্কিলতা এবং মালিন্য এসে গেছে, যে-জীবনে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে অবিশ্বাস এবং ঘৃণা? যে-মানুষ তার ভালোবাসকে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখেছে অসহায়ভাবে? সেই অপূর্ণ মানুষকে কীভাবে পূর্ণের সন্ধান দেওয়া যায়? আবার নিজেকে খণ্ডিত করলেন বিমল কর। তিন ভাগে ভাগ হয়ে 'পূর্ণ-অপূর্ণ-র তিনটি প্রধান চরিত্র হয়ে গেলেন যেন তিনি নিজেই। 'পূর্ণ অপূর্ণ শেষ হচ্ছে একটি বিদায় দৃশ্যে—মিলনের ইঙ্গিতবহ সে দৃশ্য। কোনো উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য নেই কিংবা ভাবাবেগের অপচয়। মানুষগুলি জ্বালাযন্ত্রণায় পুড়ে বয়সের অবিমৃষ্যকারতার গণ্ডী পেরিয়ে এমন এক পরিণতির চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎকে অবলোকন করছে, যেখানে ভালোবাসা রোমাঞ্চহীন, রহস্য শূন্য, রোমান্টিকতার লেশমাত্র ছোঁয়া সেখানে নেই। সে প্রেম কিছুটা বিশ্বাস, কিছুটা কর্তব্যবোধ কিছুটা বা অস্তিত্বের খাদ্য—এ রকম প্রেমের উপন্যাস আর বোধ হয় একটিই লিখেছেন তিনি। 'গ্রহণ'। ভুল বললাম, 'গ্রহণ' সঠিক প্রেমের উপন্যাস নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল সম্পর্কের একটি সুকঠিন কাহিনি বিন্যাস। উপন্যাসের চারটি চরিত্রকে একটি শ্বাসরোধকারী অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়ে তিনি সব সুদ্ধ কয়েকটি মানুষকে পরস্পরের জটিলতার মধে আবদ্ধ রেখে নিজে মগ্ন হয়ে দর্শকের ভূমিকায় বসে আছেন। আপাতদৃষ্টিতে রস-কষ-শূন্য। এই উপন্যাসটিতে বিমল কর নিজেকে সম্পূর্ণ নেপথ্যে রাখতে সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছেন। 'পূর্ণ অপূর্ণ' এবং 'গ্রহণ' এই দুটি কঠিন উপন্যাসের সমসময়ে একটি বড় গল্প লিখেছেন তিনি—'বালিকা বধূ। বিষয় বাল্য-প্রেম। কাহিনি অকিঞ্চিৎকর বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ে প্রভূত রচনা রয়েছে। কিন্তু সুকৌশলে তিনি পুরো কাহিনিটিকেই ব্যবহার করেছেন একটি ভূমিকা হিসেবে। শেষ পরিচ্ছেদের ভূমিকা। আসলে ওই শেষ অধ্যায়টুকুই তাঁর নিজস্বতা, ওইখানেই তাঁর মর্মান্তিক দহন-যন্ত্রণা। ওইখানেই তাঁকে চেনা যায় নইলে এই গল্পটির অন্যত্র এবং প্রায় সর্বত্রই তিনি অনুপস্থিত। কিন্তু শেষ অধ্যায়ে তিনি স্বরাজ্যে স্বরাট। বিরহ, মৃত্যু, নিয়তি—সেই তাঁর পুরোনো বিষয় এইখানে এক কোমল লাবণ্যে, বেদনায়, মাধুর্যে অমল। একটি ভ্রমরের মতো মগ্ন বিষণ্ণ গুঞ্জন ধ্বনি তুলে নিজের উৎস সন্ধান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুরুদ্‌গ্ন নয়, কিন্তু স্নিগ্ধ উজ্জ্বল এবং সহজ-গভীরতার আর একটি নিদর্শন। তাঁর ছোট্ট উপন্যাস 'পরিচয়।'

বিমল কর 'যদু-বংশ' লিখেছেন। সম্প্রতি এই উপন্যাসটির নাম-ডাক শোনা যাচ্ছে। তবু অনেকে বলেন যে এটা তাঁর বিষয় নয়। বিষয় ভাগ করে দিলে সাহিত্যিকের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। আমি তাঁর সমর্থক নই। 'যদুবংশ' যাদের নিয়ে লেখা তারা হচ্ছে উঠতি মস্তান ছেলে—যাদের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। নীতি, জ্ঞান, ধর্মাধর্মের বিচার নেই। আমাদের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক আকীর্ণ হয়ে আছে এইসব চরিত্রে। সমসাময়িক কালে এদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। 'যদুবংশে' বিমল করও লিখেছেন। এতে তাঁর পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবু 'যদুবংশের' চরিত্রগুলিকে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মতো করে ফুটে উঠতে দেননি বিমল কর। অলেক্ষ্যে থেকে তাদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন তিনি। সূর্য কিংবা বুললির বিপথগামিতার কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন, এদের ব্যক্তিগত পরিবারের পরিবেশকে। মালার বিকৃত যৌনশক্তির সঠিক কারণ দেননি। ফলে পুরো সমাজ-জীবনের বিকৃতি এবং তার কারণ উপেক্ষিত থেকেছে কিছুটা। দেশ-কাল-সমাজ স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবু যদুবংশ কয়েকটা দিক দিয়ে অতিশয় সার্থক। কারণ এ উপন্যাসে বিমল কর আত্মশুদ্ধি এবং পবিত্রতার একটি আগ্রহ যে সমস্ত

মানুষের ভিতরেই বর্তমান সেটি সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন। তবু হয়তো অনেকের একটা আপত্তি থেকেই যাবে—এ উপন্যাসের পাপী ছেলেরা যেন যথেষ্ট পাপী নয়। খানিকটা যেন শুদ্ধ, কিঞ্চিৎ কোমলহৃদয়েরও বটে।

ব্যক্তিগত জীবনে বিমল কর সাদা সিধা মানুষ। নির্বিরোধী, হই-চই গণ্ডগোল পছন্দ করেন না, নিজের পরিচিত একটি নির্দিষ্ট বৃত্তেই তাঁর মেলামেশা সীমাবদ্ধ থাকে—তাঁকে অনেকটাই কুনো-স্বভাবের বলা যায়। কলকাতার রাস্তা পার হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনকরনে, ট্রামে-বাসে উঠতে প্রায়শই অপারগ হন, ভীড়ে গণ্ডগোলে দিশেহারা বোধ করেন। রোগের ভয়ে প্রায় সময়েই তিনি অস্থির। সৎ এবং দয়ালু। তবু এই মানুষ গোয়েন্দা কাহিনির ভক্ত, অপরাধমূলক কাহিনি তাঁর প্রিয়। যুদ্ধের বই পড়া এবং সিনেমা দেখা দুই ইস্তার পুরোনো নেশা। মাঝেমধ্যে গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন তিনি, ইদানীংও লিখছেন। নিজের লেখা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তিনি হয়তো গর্বিত (যেটা অযৌক্তিক নয়) কিন্তু কখনোই তৃপ্ত নন। অবসর সময়ে কিংবা আড্ডায় তিনি সাহিত্যের আলোচনা কমই করেন, যেটুকু করেন তার মধ্যে নিজের কৃতিত্বের প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর মনোভাব হতাশাব্যঞ্জক হতে লক্ষ্য করেছি। মাঝেমধ্যে হাসির গল্প লিখেছেন তিনি—সিরিয়াসভাবে নয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাসির গল্পে তাঁর স্বভাব সিদ্ধি আছে। কালিদাস ও কেমিস্ট্রি—এরকমই একটি গল্প। লেখায় তিনি যতটা গম্ভীর, আলাপে ততটা নন। তিনি হাস্যপরিহাস প্রিয়। তাঁর লেখায় নিঃসঙ্গতাবোধ প্রবল, তাই বোধ হয় তিনি সঙ্গপ্রিয়, একা থাকতে কিংবা একা চলাফেরা করতে তিনি স্বচ্ছন্দবোধ করেন না। কখনো কখনো তাঁকে ধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে আগ্রহী হতে দেখেছি। ইদানীং তাঁর সে আগ্রহ হয়তো বেড়েছে। তাঁকে ঈশ্বর বা ধর্মবিশ্বাসী বলা যায় না, তবু যারা বিশ্বাসী তাদের প্রতি তাঁর নিবিড় কৌতূহল আগ্রহ এবং পরোক্ষ সমর্থন দেখেছি। তাঁর নিজস্ব একটা বিশ্বাসের ভূমি আছে। মানুষের সততা দায়িত্ববোধ দয়া—এগুলিই সেই বিশ্বাসের ভূমি। রাজনীতিতে তিনি অনাগ্রহী, তবে সেখানেও তাঁর একটা নিজস্ব মত আছে। কিন্তু সেটা প্রবল নয়। সাজে পোশাকে এবং আচার আচরণে তিনি খাঁটি বাঙালি। চমৎকার মোটর গাড়ি চালাতে পারেন।

গোবিন্দপুরের রাসমেলায়

গোবিন্দপুরের মেলায় গেছেন নাকি কখনো! বড় জম্পেশ মেলা মশাই। আড়েদিঘে যেমন পেল্লায়, জাঁকজমকেও একেবারে হরিপদ। চোখের পলকই পড়তে চায়না মশাই। যেদিকে চোখ ফেরাবেন সেদিকেই চমক। সরেস জিনিস যদি চান তাহলে চক্ষু মুদে গোবিন্দপুরের রাসের মেলায় চলে যাবেন। রাধাগোবিন্দজিউয়ের ঠেকে একবার নমো ঠুকে মেলায় সামিল হয়ে গেলেই হল। ফুরফুর করে সময়টা কেটে যাবে দেখবেন।

তোর তো ট্যাঁকের অবস্থা গুরুচরণ, তা তুই মেলায় গিয়ে করিসটা কি?

আজ্ঞে, মেলায় তো ট্যাঁকের বিলিব্যবস্থা করতেই যাওয়া কিনা। কেনারাম না হলুম, বেচারাম হতে তো দোষ নেই! কী বলেন?

তা ঠিক। কিন্তু বেচিস কি? মামলোত না থাকলে ব্যবসাই বা হয় কি করে? হ্যাঁ রে, চুরি ধারি শুরু করলি নাকি?

করলেই বা দোষ কি বলুন? ভগবান যদি তাই কপালে লিখে দিয়ে থাকেন তো আমার আর কি করার আছে বলুন দিকি। তবে এ ঠিক চুরির বৃত্তান্ত নয়। বলতে নেই, লোকের ভাগ্যবিচার করে ইদানিং আমার দুটো পয়সা হচ্ছেও।

বলিস কী! তুই তো খুনে লোক দেখছি। তুই জ্যোতিষী শিখলি কবে?

আজ্ঞে গরিবদের কত কী মুষ্টিযোগ শিখে রাখতে হয় তার কিছু ঠিক আছে বরেনবাবু! কোনটা কাজে লেগে যায় কে বলবে। এই তো সেদিন কুঁড়েপুকুরের মাঝবয়সী একজনাকে প্রথমেই বললুম, আপনার সময়টা তো ভালো যাচ্ছে না মশাই! লোকটা শুনে সটান পা জড়িয়ে ধরল, ঠাকুরমশাই, আমাকে বাঁচান।

বলিস কি রে! লোকে তোর কথা বিশ্বাসও করে? তা তুই কী করে বুঝলি যে লোকটার সময় খারাপ যাচ্ছে?

কারই বা সময় ভালো যাচ্ছে বলুন! ভিড়ের মধ্যে কথাটা চারিয়ে দিয়ে দেখুন, সবাই মাথা নেড়ে বলবে, সময়টা ভালো যাচ্ছে না মোটেই। তারপর ধানাই পানাই করে দুর্যোগের মুষ্টিযোগও বাতলাতে হয়। পাঁচু গোসাঁইয়ের কাছে তালিম নিয়েছিলুম কিনা। ওঁরও ওইরকম কায়দা ছিল। প্রথমেই পিলে চমকে দিয়ে পরে ধীরে ধীরে সুতো ছাড়া। সব কাজেরই তো একটা ধাঁচা আছে মশাই।

তোর কথাটা বাপু, ফেলে দেওয়ার মতো নয়। যা দিনকাল পড়েছে তাতে টিকে থাকার জন্য মানুষকে দিনে-রেতে মাথা ঘামিয়ে যেতে হচ্ছে। তা পাঁচু গোঁসাইয়ের নামে বিধবার সম্পত্তি গাপ করার একটা নালিশ হয়েছিল বলে শুনেছিলুম যেন!

তা মিছে শোনেননি কর্তা! নালিশ একটা হয়েছিল ঠিকই। তবে মোকদ্দমা গড়ানোর আগেই সেই বিধবা অবলাবালা পটল তুলে ফেলল যে! বাঁচা-মরা তো আর মানুষের হাতে নয়! অবলাবালার ভাইপো নিমাই কয়েকদিন লাফালাফি করে রণে ভঙ্গ দেয়। আর সম্পত্তি বলতেও তো আর তোষা বালাখানা নয়, একটা কুঁড়ে ঘর আর তিন বিঘে জমি। নিমাই তাই আর মামলার পিছনে টাকা ঢালেনি। সে নেশাখোর মানুষ, ট্যাঁকেরও তেমন জোর নেই কিনা।

তা পাঁচু গোসাঁই যে কবে জ্যোতিষী শিখল কে জানে বাপু! আমি তো বরাবর তাকে পয়সাওয়ালা মদন বিশ্বেসের পিছনেই ঘুরঘুর করতে দেখলুম।

ঠিকই দেখেছেন! দু-দুটো পেট্রল পাম্প আর হাটখোলার পাইকিরি কারবারে মদন একেবার টাকায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার মোসাহেবও মেলা। তা তাদের মধ্যে পাঁচু ঠাকুরও ছিলেন বটে। তবে তেমন সুবিধে হয়ে ওঠেনি। বড়লোকেরা লোক চেনে বলেই বড়লোক হতে পারে। তারা আমাদের মতো তো নয়।

কথাটা জব্বর বলেছিস। বড়মানুষেরা আমাদের মতো আহাম্মক হলে কি লোক চরিয়ে খেতে পারত? তা পাঁচু গোসাঁইয়ের বৃত্তান্তটা কী বলবি তো!

পাঁচু গোসাঁইয়ের যে দুখানা সংসার তা জানা আছে তো! একটা জগাছায়, আর একটা কোগ্রামে। তা কোগ্রামের ছোট বউয়ের ওপরেই টান ছিল বড্ড। তা বউটা হঠাৎ একদিন সাপকাটিতে ভোকাট্টা হয়ে যাওয়ার মনের দুঃখে চারটে গ্যাদড়া বাচ্চাকে বড় বউয়ের জিম্মা করে দিয়ে পাঁচু ঠাকুর বিবাগী হওয়ার ফিকিরে ছিলেন। সেই সময়ে ফুলপুকুরের জটাবাবার সঙ্গে দেখা। তা তিনিই কোষ্ঠী বিচার করে বললেন, তোর সন্ন্যাসের যোগই নেই। তুই বরং জ্যোতিষী শিখে সংসার থেকে একটু গা আলগা হয়ে থাক। তা সেই থেকে পাঁচু ঠাকুর ওই বিদ্যেয় হাত পাকিয়ে ফেলেছেন। আমি তাঁর শাগরেদী করে দু-পয়সা কামাচ্ছি বই তো নয়।

এ তো লোক ঠকিয়ে খাওয়া রে!

কী যে বলেন বরেনবাবু! লোক ঠকাতে যাবো কোন দুঃখে? বিদ্যে বেচে খাওয়া কি আর চুরি-ডাকাতির মধ্যে পড়ে? তাহলে তো ইস্কুল কলেজে গন্ডায় গন্ডায় চোর -ডাকাত। তবে কিনা কোনো বিদ্যেই নির্দোষ নয়, তাতে ছিদ্র থাকবেই। গণনায় ভুলচুক তো হতেই পারে। কি বলেন! পাঁচটা বললুম, হয়তো তিনটে মিলল।

বুঝেছি। তা গোবিন্দপুরে রাসের মেলা নিয়ে কী বলছিলি যেন।

যে আজ্ঞে, বড় জব্বর মেলা মশাই। পিলপিল করছে লোক। আর বিকিকিনি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ব্যাপারীরা কাছা খুলে বেচছে, আর খরিদ্দারেরা পাগলের মতো কিনছে। লাখো লাখো টাকার মাল চোখের পলকে গস্ত হয়ে যাচ্ছে। চক্ষু সার্থক। কত বড় বড় ব্যাপারী গোবিন্দপুরের মেলায় একটু জায়গা পাওয়ার জন্য হেদিয়ে মরছে। দশ বিশ হাজার ঢালতেও রাজি, কিন্তু মাথা কুটলেও জায়গা মেলা ভার।

বটে! তাহলে তুই জোটালি কী করে? হাটের কর্তারা কি তোর বেয়াই লাগে?

সে একটা বৃত্তান্তই বটে। আমার মতো চুনোপুঁটির কি সেখানে নাক গলানোর উপায় আছে? পাকা কাঁঠালে মাছি পড়ার মতো অবস্থা। তা হয়েছিল কি, মাস দুই আগে গাজনপুরের এক যজমানবাড়ি থেকে সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরছিলাম। বৃষ্টিবাদলার দিন। জলেকাদায় চারদিক থিকথিক করছে, তার ওপর অন্ধকার। সঙ্গে বাতিটাতিও নেই। তবে কিনা আমার অভ্যেস আছে বলে তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না।

পাথরডুবির রথতলা পেরোনোর সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক উদয় হয়ে আমার পিছুপিছু আসছিল। দিনকাল ভালো নয় বলে আমি একটু পা চালিয়ে হাঁটছিলুম, লোকটা পিছন থেকে হাঁক মেরে বলল, ওহে বাপু, আমি বুড়ো মানুষ, হাঁটুর জোর নেই, একটু আস্তে হাঁটো, দুটো কথা কইতে কইতে যাই।

তা আমি ভাবলুম, চোর-ডাকাত হলেই বা কি! আমার ট্যাঁক তো ঢুঢু। তাই রাস টেনে বললাম, তা কর্তা যাবেন কোথায়! আর এই দুর্যোগে বেরিয়েছেনই বা কেন।

তা তিনি আমার পাশে পাশে হাঁটা ধরে বললেন, আর বোলোনা হে! আদায়-উশুলেই বেরোতে হয়। পাওনাগণ্ডা ফেলে রাখলেই ফর্সা। তাই এই দুর্যোগ মাথায় করেই বেরোতে হয়েছিল। আমার আবার ছেলে নেই কিনা! তিনটেই মেয়ে, আদায় উশুল কে করে বলো।

আমি একটু ভয় খেয়ে বললুম, তা কর্তা, সঙ্গে টাকাপয়সা আছে নাকি?

উনি বললেন, তা আছে বাপু। তোমাকে আগেই বলে রাখি, যদি ডাকাত হয়ে থাকো তবে মেরে কেটে নিওনা। চাইলেই দিয়ে দেবো। এ বয়সে মারধর খেতে পারব না বাপু। আমি বড় ভিতু মানুষ।

আমি বললুম, সে ভয় নেই। গরিব হলেও লোক তেমন মন্দ নই।

লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমাকে তো বলেইছি যে আমি বড় ভিতু মানুষ। আমার সবচেয়ে বেশি ভয় অশরীরীদের। তুবি বাপু আমাকে কাটাখালির সাঁকোটা পার করিয়ে দিও। ও জায়গাটার খুব বদনাম শুনি।

আমি বললুম, তা বদনাম আছে কর্তা, একজন বৌ মানুষ ডুবে মরেছিল কিনা। অনেকে অনেক কিছু দেখতে পায় বটে ওখানে।

লোকটা ভারি ভয় খেয়ে বলল, আমি কিছু দেখলে হার্ট ফেল হয়ে যাবে বাপু, তুমি আমাকে একটু সাঁকোটা পার করিয়ে দিও।

আমি বললুম, কিন্তু আমি ততদূর যাবো না মশাই। তার আগেই নন্দপুরের তেমাথা থেকে বাঁয়ে ঘুরে ঘুসুরি গাঁয়ে যাবো, সেখানেই আমার বাড়ি কিনা।

লোকটা বলল, বাপু হে! আমার হার্ট ফেল হলে তোমার কিন্তু নরহত্যার পাপ হবে। কিছু মনে কোরো না আমি তোমাকে পুষিয়ে দেবোখন।

আমার বুক এখনই দুরদুর করতে লেগেছে। দেখলুম বুড়োমানুষ বড্ড লাতন হয়ে পড়েছেন, অতি ভয়ে মানুষ অক্কাও পায় শুনেছি। তাই বললুম, তা না হয় কাটাখালির সাঁকো আপনাকে পার করিয়ে দিলুম। কিন্তু আমার যে দুনো রাস্তা ফিরে আসতে হবে। তা তিনি আমার হাতে পায়ে ধরেন আর কী।

কী আর করা, খাল পার করিয়ে একটু এগিয়ে দিয়ে যখন ফিরতে যাচ্ছি উনি আমার হাত ধরে বললেন, বাপু, তুমি বড় সাচ্চা লোক, এই নাও পাঁচশোটা টাকা রাখো।

আমি টাকাটা ফিরিয়ে বললুম দূর মশাই! এর জন্য কেউ টাকা নেয় নাকি? যান তো বাড়ি যান।

উনি ছাড়লেন না। বললেন, ঠিক আছে, টাকা না নিলে না নেবে, কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যে আর বাড়ি ফিরে কাজ নেই। এই কাছেই আমার বাড়ি রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে বাড়ি ফিরলেই হবে।

একটু গাইগুঁই করেছিলেন বটে, তবে ভেবে দেখলুম, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমার তো তিন কুলে কেউ নেই যে বাড়িতে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে আমার জন্য।

তা রাজি হয়ে থেকে গেলুম বুড়োর বাড়িতে। গিয়ে চোখ ট্যারা। পেল্লায় বাড়ি, লোক লস্কর, ধানের মড়াই, গোশালা, হইহই কাণ্ড। পাকা ঘরে বিজলি বাতি জ্বলছে। রাতে গরম খিচুড়িতে ঘি ঢেলে সঙ্গে বেগুনি পাঁপড়ভাজা পোস্তর বড়া দিয়ে ভোজ। সে এক কাণ্ডই বটে। রাতে দিব্যি তক্তপোশে মশারি খাটানো বিছানা। এক রাত্তিরের জায়গায় পাক্কা চারদিন জামাই আদরে থাকতে হল মশাই।

তা হ্যাঁ রে, বৃ,ত্তান্ত যা বললি তাতে শেষ অবধি বুড়ো তোকে জামাই করে নেয়নি তো!

না বরেনবাবু, বৃত্তান্তটা ওদিকে গড়ায়নি। বুড়োর তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে ছেলেপুলে অবধি হয়ে গেছে। তবে মহিম পোদ্দার সোজা লোক নয়। পঞ্চায়েতের মাথা, একবার নাকি এম এল এ হতে গিয়ে ভোটে হেরে যায়। তাছাড়া অনেক কমিটি টমিটির মেম্বার। সাতপুর গাঁ তো গোবিন্দপুরের কাছেই। তা মহিমবাবুই মেলা কমিটিকে বলে কয়ে একটা জায়গায় বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে কিছুদিন রোজগার করলুম মশাই। তাবিজ, কবচ, পাথরও বিক্রি হয়েছে মন্দ নয়।

দূর আহাম্মক! আর একটু গুছিয়ে নিতে পারতি তো! মহিম পোদ্দারের নাম আমরাও জানি। শাঁসালো লোক। গোবিন্দপুরের রাসমেলায় জায়গা পাওয়ার চেয়ে আর বেশি কিছু বাগাতে পারলি না?

তা যা বলেছেন। বাগিয়ে তো নেওয়াই যায় মশাই। তবে কিনা ওসব করলে রাতে ঘুম হয় না, মশার মতো কী যেন কুটকুট করে কামড়ায়।

হারু

পালচৌধুরীদের বাড়িতে সকালবেলায় দুধ দিতে গিয়েছিল কানাইবাঁশি।

গিন্নিমা অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিতে দুধ নিতে নিতে হঠাৎ বললেন, তা হ্যাঁ রে কানাই, সঙ্গে করে কাকে নিয়ে এসেছিস বল তো? তোর পেছনে ওই দাঁত বের করা হাড়গিলে চেহারার লোকটা কে?

কানাই একঝটকা পিছনটায় দেখে নিয়ে আকাশ থেকে পড়ে বলে, আমার সঙ্গে তো কেউ নেই গিন্নিমা! আমি তো কই কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা।

পালগিন্নি বিরক্ত হয়ে বলেন, আমার চোখে চালসেও ধরেনি, ছানিও পড়েনি। ওই তো—দেখ না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘ্যাঁসঘ্যাঁস করে বগল চুলকোচ্ছে। জলজিয়ন্ত লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিসনা! চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি?

কানাইবাঁশি আর কথা বাড়াল না। কারণ তার মনে একটা ধন্দ আছে। পরশু গোবিন্দ তর্কালঙ্কারও এরকমই কী একটা বলছিলেন যেন। বামুনপাড়া দিয়ে হাটপানে যাওয়ার সময় হঠাৎ গোবিন্দখুড়ো তাঁর দাওয়া থেকে হাঁক মেরে বলে উঠলেন, বলি হ্যাঁরে বাঁশি, আজকাল কি বডিগার্ড নিয়ে ঘোরাফেরা করিস নাকি? তা একটা জুৎমতো বডিগার্ড পেলিনা! এ তো একেবারে ল্যাকপ্যাক সিং রে!

কানাইবাঁশি আশেপাশে কাউকেই দেখতে না পেয়ে ভারি অভিমান করে বলেছিল, খুড়োমশাই কি এই গরিবের সঙ্গে রঙ্গ করছেন? আমি দিন আনি-দিন খাই মানুষ, আমার আবার বডিগার্ড কিসের?

গোবিন্দ তর্কালঙ্কার বললেন, তবে ওটা কে রে তোর সঙ্গে? কোথা থেকে আমদানি করলি বাপু? দেখিস আবার গাঁয়ে চোরছ্যাঁচড় ঢুকিয়ে বসিস না যেন!

কথা আর গড়ায়নি, কিন্তু ধন্দটা রয়ে গেছে। সঙ্গে কেউ নেই বটে, কিন্তু দু-দুজন লোক যখন বলেছে, তখন কিছু একটা ব্যাপার থাকতেও পারে!

নবকেষ্ট বন্ধু মানুষ। ঠাট্টা-তামাশারই সম্পর্ক। বাড়ি বাড়ি গাহেকদের দুধের জোগান দিয়ে ফাঁকা বালতি দোলাতে দোলাতে বাড়ি ফেরার সময় কদমতলায় নবকেষ্টর সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, কী ব্যাপার রে কানু, তোর কি রাতারাতি অনেক পয়সা হয়েছে নাকি?

নাতো নবু! হঠাৎ একথা কইছিস কেন?

পয়সা বেশি হয়নি তো কাজের লোক রেখেছিস কোন আক্কেলে?

কানাইবাঁশি ফের আকাশ থেকে পড়ে বলে, খেপেছিস নাকি!

আমি ছাপোষা মানুষ, খেটেখুটে দুধ বেচে খাই, কাজের লোক রাখতে যাবো কোন দুঃখে? নবাবপুত্তুর তো নই রে বাপু।

তা ভালো কথা, তাহলে তোর পিছুপিছু ওই লোকটা আজকাল ঘুরঘুর করে কেন? ও তো তোর শালা সম্বন্ধীও কেউ নয়।

কানাইবাঁশি কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, ভাই রে, সবাই যদি এরকম আজব কথা বলে তাহলে তো বড্ড মুশকিল! আমার মাথার দোষ হয়েছে কিনা তা যে বুঝতে পারছি না। আমার পিছনে কেউ তো ঘুরঘুর করছে না রে ভাই। তাহলে তোরা কাকে দেখছিস বল তো?

কেন, ওই যে হ্যাংলা চেহারার বড় বড় দাঁতওয়ালা মাঝবয়েসি একটা লোক! ওই তো তোর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা খুব মন দিয়ে শুনছে। দ্যাখ না পিছু ফিরে!

তা পিছু ফিরে দেখলও কানাইবাঁশি, কেউই নেই। সে হতাশ হয়ে মাথা নাড়া দিয়ে বলে, না রে! আমাকে বোধহয় চোখের ডাক্তারই দেখাতে হবে। আমি তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছিনা। নবু, তুই ভূত দেখছিসনা তো?

নবু বলে, ভূত দেখব কেন, দিনেদুপুরে কি ভূত দেখে কেউ?

এই বলে একটু এগিয়ে এসে হাত দিয়ে কানাইবাঁশিকে একটু পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নবু অদৃশ্য লোকটার উদ্দেশ্যে বলে, ওহে বাপু, তুমি আসলে কে বলো তো? কোন মতলবে কানুর পিছনে ঘুরঘুর করছো?—অ্যাঁ, মতলব খারাপ নয়? কিন্তু তোমার নামধাম পরিচয় কী? কোথা থেকে আগমন?—সেসব বলতে চাওনা! এ তো ভালো জ্বালা হল দেখছি!

তারপর হতাশ হয়ে কানাইবাঁশির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে নবু বলে, না রে, লোকটা বেজায় বেয়াদব। পাত্তাই দিতে চাইছে না। এখন তুই বুঝে দ্যাখ কী করবি। আমার আজ গরু কিনতে যাওয়ার কথা, বায়না করা আছে। তাই আমি চললাম।

কানাইবাঁশি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে তার বউ ব্রজবালাকে বলল, হ্যাঁ গা, ইদানীং কি তুমি আমার আশেপাশে কাউকে দেখতে পাও? এই রোগামতো, দাঁতউঁচু মাঝবয়েসি কোনো লোককে?

ব্রজবালা অবাক হয়ে বলে, ওমা গো! তোমার সঙ্গে আর কেউ ঘুরে বেড়াবে কেন? ও কি সব্বোনেশে কথা!

কিন্তু লোকে যে বলছে আমার সঙ্গে কে একটা হাড়গিলে চেহারার লোক নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে! তাকে আর সবাই দেখতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু আমি তো কই দেখতে পাচ্ছিনা।

লোকে তোমাকে নিয়ে বোধহয় রঙ্গ করছে, তুমি ওতে কান দিওনা তো! আমি হারুকে বলে দেবো'খন, সে যেন তোমার চারপাশটা নজরে রাখে।

কানাইবাঁশি অবাক হয়ে বলে, হারু? হারুটা আবার কে বলো তো?

সে কী! হারুকে চিনতে পারছ না? তোমার কি স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে নাকি?

আহা স্মৃতিভ্রংশ হবে কেন? হারু বলে কাউকেই তো আমি চিনি না।

ব্রজবালা স্তম্ভিত হয়ে বলে, চেনো না? তাহলে এই বেলা নগেন কোবরেজকে গিয়ে ধরে পড়ো। তোমার মাথারই দোষ হয়েছে গো! ওই তো হারু পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে মুড়ি আর শশা খাচ্ছে। দেখছ না?

কানাইবাঁশি দেখছে না, সত্যিই কাউকে দেখতে পাচ্ছেনা। তবে সেটা কবুল করতে তার সাহস হলনা। তাহলে ব্রজবালা তাকে সত্যিই পাগল বলে দেগে দেবে। তাই সে আমতা আমতা করে বলে, ও। তাহলে তাই হবে বোধহয়। হ্যাঁ, ওটা তো হারু বলেই মনে হচ্ছে যেন।

কিন্তু এই মিথ্যাচার করতে হল বলে তার নিজের ওপর রাগও হচ্ছিল খুব। কিন্তু সে করবেই বা কী? হারু পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে শশা দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে, তার বউ দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সে পাচ্ছেনা! তার আট বছর বয়েসি মেয়ে টুসি উঠোনের একধারে কোট কেটে একাএকা এক্কাদোক্কা খেলছিল। কানাইবাঁশি চুপ করে গিয়ে টুসির কানে কানে বলল, হ্যাঁ রে টুসি, পুবের ঘরের দাওয়ায় ওটা কে বসে আছে বল তো?

টুসি ঝামটা মেরে বলল, আহা, ওই তো হারুকাকা বসে মুড়ি খাচ্ছে। কাল কত করে বললুম, ইতুদের কুলগাছ থেকে একটু কুল পেড়ে দিতে, কিছুতেই দিল না, জানো?

আচ্ছা, হারুকাকা দেখতে কেমন বল তো?

বিচ্ছিরি! দু-চোখে দেখতে পারিনা।

হারুকাকা কতদিন যাবত এবাড়িতে আছে বলতে পারিস?

হ্যাঁ বাবা, তোমার কী হয়েছে বলো তো? এই তো তিনদিন আগে তুমি বিকেলে হারুকাকাকে নিয়ে বাড়ি এলে। তারপর মা হারুকাকাকে জিজ্ঞেস করে করে সব বৃত্তান্ত বের করল।

কানাইবাঁশি চোখ বড় বড় করে বলে, কী বৃত্তান্ত বলতে পারিস?

তুমি বুঝি জানো না?

আহা, তোর মায়ের সঙ্গে কী কথা হয়েছে তা তো আর জানি না!

ওই তো, হারুকাকা বলল, তুমি নাকি ওর জ্ঞাতি ভাই। তোমাকে চোখে চোখে রাখার জন্য সঙ্গে থাকতে এসেছে। আমি আর কিছু জানিনা।

কানাইবাঁশি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। না, তারই বুদ্ধিবিভ্রম হয়েছে! ব্যাপারটার একটা মীমাংসা না হলে শান্তি নেই।

দুপুরে খেয়েদেয়ে কানাইবাঁশি চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ল। নির্জন বটতলায় এসে ঘাসের ওপর বসে কিছুক্ষণ চারপাশটা দেখে নিয়ে সতর্ক গলায় বলল, হারুভায়া কি কাছেপিঠে আছো নাকি হে?

খুক করে কে যেন গলার একটা শব্দ করল। তারপর মোলায়েম গলায় বলল, আছি হে কানাইবাঁশি।

তুমি কি যাদুটাদু জানো নাকি হে?

মোটেই না। ওকথা উঠছে কেন?

না, এই বলছিলুম আর কি! তা বাপু, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবে? তোমার মতলবখানা কী?

কোন মতলবের কথা কইছো হে?

বলি, আমার পিছনে লেগে আছো কেন?

কেন, তোমার তাতে অসুবিধে কি? আমি তো তোমাকে আঁচড়েও দিইনি, কামড়েও দিইনি!

তা দাওনি বটে। কিন্তু তুমি আমার চোখে গায়েব হয়ে আছ কেন? অন্য সবাই তোমাকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমি পাচ্ছিনা, এ আবার কীরকম রগড় হে?

দেখতে পেলে তো গলা টিপে ধরতে। আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখছি কিনা। তাছাড়া মনে পাপ থাকলে অনেক কিছুই চোখে পড়ে না।

চোখে চোখে রাখছই বা কেন? আর পাপের কথাই বা ওঠে কোন কারণে?

তোমাকে একটা হিসেব দিই। তোমার মোটে দুটো গরু, তার মধ্যে একটাই দুধ দেয়। তাও মোটে তিন সের।। আরও দু-সের তোমাকে জোগান দেয় শিবু গয়লা। মোট পাঁচ সের দুধ তোমার সম্বল। তাহলে তুমি তিনজন গাহেককে এক সের করে, চারজন গাহেককে আধসের করে, আরও চারজনকে এক পো করে দুধ দাও কী করে?

ও তুমি ঠিক বুঝবে না। হরেদরে হয়ে যায়।

আরও কথা আছে। তোমার পোয়ার মাপ এক ছটাক কম আছে কিন্তু। আমি মেপে দেখেছি।

তুমি তো খুব বেয়াদব হে! আমার এ গাঁয়ে একটা সুনাম আছে, তা জানো?

তা জানি। তোমার গাহেকরা তোমাকে খুব বিশ্বাস করে। তুমি লোক খারাপও নয়, আমি জানি। তোমার ধর্মভয় আছে।

তবেই বোঝো। আমার সঙ্গে হিসেব করে কথা কইবে।

গত বছর পুজোর আগে তোমার বউ তোমার কাছে একজোড়া সারদা বালা চেয়েছিল, মনে আছে?

তা থাকবেনা কেন? খুব মনে আছে। তা হঠাৎ সে কথা কেন?

তুমি গড়িয়েও দিয়েছিলে, ঠিক তো?

তা তো বটেই।

সারদা বালা বাবদ রাজু স্যাঁকরার কাছে তোমার লাখখানেক টাকা বাকি পড়ে যায়। তাই না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানাইবাঁশি বলে, তা বটে। বাকিটা এখনও শোধ হয়নি।

আমি তো সেই কথাটাই তোমাকে ফাঁকমতো বলব বলে ঘুরঘুর করছি। ওই সারদা বালা কেনার আগে পর্যন্ত তুমি একজন ভালমানুষই ছিলে বটে। তোমার গরুর দুধে জল মিশত না। সারদা বালার পর মিশছে। ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? এইভাবেই কিন্তু শুরুটা হয়, তারপর পিছলে যাওয়ার রাস্তা কোল পেতেই আছে।

কানাইবাঁশি একটু ভাবল। তারপর বলল, তাহলে কী করতে হবে?

ন্যাকা সেজো না কানাইবাঁশি, কী করা উচিত তা তুমি ভালোই জানো। দুনিয়ার একটা সৎ লোক যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ভগবানের বড় কষ্ট হয়। কথাটা মনে রেখো।

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থেকে কানাইবাঁশি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এখনো আছ নাকি হে হারু?

কিন্তু হারুর আর সাড়া পাওয়া গেল না।

পুতুলওয়ালা

একটা চটের বস্তা কাঁধে নিয়ে আধবুড়ো লোকটা প্রায়ই পুরোনো জিনিস কিনতে আসে। পুরোনো বাসন, অচল ঘড়ি, অকেজো হারমোনিয়াম, ভাঙা দা, কুড়ুল, বা বাতিল বইপত্র যাই হোক। লোকটা ভারী রোগাভোগা, এলোথেলো চুল, রুখু দাড়ি, গায়ে ময়লা একটা গেঞ্জি, পরনে চেককাটা সবুজ বা নীলরঙা লুঙ্গি, পায়ে তাপ্পিমারা একজোড়া চটি। কিন্তু নিত্যি নিত্যি তো আর লোকের ঘরে বিক্রি করার মতো জিনিস থাকে না, তবু লোকটা আসে। তারপর হাঁফ ছাড়ার জন্য বলাইদের বাড়ির খোলা বারান্দায় বসে একটু জিরোয়। একটু জল চেয়ে খায়, তারপর কোথায় যেন চলে যায়।

আজও এসেছে লোকটা। বলাইদের বাড়ির বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে কখন অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ রোববার বলে দোকানপাট বন্ধ, তাই বলাইয়ের বাবা হরি সামন্ত আজ বাড়িতেই আছে। সে দুপুরবেলা ভাত খেয়ে পান মুখে দিয়ে পিক ফেলতে বারান্দায় এসে দেখে লোকটার পাশে রাখা চটের বস্তার খোলা মুখ দিয়ে ভারী সুন্দর টুকটুকে একটা পুতুলের মুখ বেরিয়ে আছে। যেন খুব অবাক হয়ে চারপাশটা দেখছে, আর তার মুখে ভারী একটা খুশিয়াল হাসি।

হরি সামন্ত বিষয়ী মানুষ। দুনিয়ার ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়া সে আর কিছুই তেমন বোঝে না। না বোঝে গানবাজনা, না বোঝে শিল্পসাহিত্য, না বোঝে দয়াধর্ম। পয়সাই তার মা-বাপ, পয়সাই তার ঠাকুরদেবতা, পয়সাই তার জানমান। তবে আজ যেন তার কী একটা হল! পুতুলটা দেখে আর চোখ সরাতে পারল না। অবাক হয়ে দেখতে লাগল। দেখতে লাগল তো দেখতেই লাগল। একবার যেন মনে হল, পুতুলটার চোখ পিটপিট করছে, একবার মনে হল, পুতুলটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকেও একবার আড়চোখে দেখে নিল, আর-একবার মনে হল, পুতুলটা যেন হঠাৎ একটা হাত বের করে হরি সামন্ততে হাতছানি দিয়ে ডেকেই হাতটা লুকিয়ে ফেলল। চোখের ভুলই হবে, তবু হরি সামন্ত ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারল না। সাত-পাঁচ ভেবে লোকটাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, ওহে বাপু, পুতুলটা কি বেচবে নাকি?

লোকটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে অলস গলায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, কেন, আপনি কিনবেন নাকি?

যদি ধরো কিনতেই চাই?

লোকটা এবার একটু উদাস হয়ে বলে, আজ্ঞে ও পুতুল বেচবার জন্য নয়। পদ্মপুকুরের বনেদি রায়বাড়ির জিনিস। অনেক কষ্টে, অনেকবার টানা মেরে তবে পুতুল হাসিল করা গেছে। এখন ও পুতুল হাসনগঞ্জের বড়মানুষ গোপেনবাবুর জিনিস। তিনি দু-হাজার টাকা হেঁকেই রেখেছেন।

পুতুলের দাম দু-হাজার শুনে হরি সামন্তর একটু মূর্ছামতো হল। মিনিট দুই বাদে মূর্ছা কাটিয়ে উঠে হরি বলে, কত যেন বললে বাপু? আরেকবার বলবে নাকি?

আজ্ঞে দু-হাজার! তার ওপর রাহাখরচ বাবদ আরও শ'দেড়েক ধরে রাখুন। মোট গিয়ে বাইশশোয় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কর্তা! একটু সামলে কর্তা, ফের যেন মূর্ছা যাবেন না।

হরি মূর্ছা গেল না বটে, কিন্তু বড়মানুষের মূর্খামি দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, আমি তো ভেবেছিলাম বিশ-বাইশ টাকা হলেই তুমি পুতুলটা বেচতে রাজি হয়ে যাবে।

আজ্ঞে আমি গরিব মানুষ এমনিতে ও পুতুল বিশ-বাইশেই হয়তো বেচে দিতুম, কিন্তু এ হল চুক্তির ব্যাপার। তার ওপর গোপেনবাবু ভারী মেজাজি মানুষ কিনা, যা তাক করে দেগে রেখেছেন তা না-পেলে কুরুক্ষেত্র করবেন। পয়সাওয়ালাদের মেজাজ কেমন হয় তা কি আর বলে দিতে হবে কর্তা?

কথাটায় একটু আঁতে লাগল হরি সামন্তর। কারণ পয়সাওয়ালা লোক সে নিজেও, তবে তার ঠাঁটবাট নেই বলেই সে তেমন কল্কে পায় না। লোকে তাকে কেষ্টবিষ্টু বলে ভাবলই না কখনো! গলাখাঁকারি দিয়ে সে বলল, তা তোমার সেই বড়মানুষ গোপেনবাবু কি পাগল?

পাগল হতে যাবেন কোন দুঃখে?

পাগল না হলে কোনো বিষয়ী মুরুব্বি মানুষ কি দু-হাজার টাকা কবুল করে পুতুল কেনে হে?

গোপেনবাবুকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না যেন কর্তা! যেমন পয়সা তেমনি দিলদরিয়া মেজাজ। অনেকে পয়সা করে বটে, কিন্তু হাত দিয়ে জল গলে না। তা গোপেনবাবু তাদের মতো পিচেশ নন। বাপের ব্যাটা বললে বলতে হয় বটে গোপেনবাবুকে! পুতুল দিয়ে তিনি কী করবেন তা তিনিই জানেন। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের দাম জেনে কী হবে বলুন।

তা তিনি তাঁর পয়সার গরম দেখাতে হাতি কিনতে পারতেন, জাহাজ কিনতে পারতেন, হাওড়ার পোল বা কুতুবমিনার কিনতেই বা বারণ করেছে কে? তা বলে একটা পুঁচকে পুতুলের জন্য দু-হাজার টাকা!

তার সঙ্গে রাহাখরচটাও ধরবেন কর্তা!

তাও নাহয় ধরলুম, কিন্তু ব্যাপারটা কি বেজায় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, বাপু?

তা বাবু, আমরা গরিবগুরবো মানুষ, আমাদের কি বড় মানুষদের বিচার করা সাজে? তাঁরা কখন কী করবেন, কেন করবেন, তা আমি বলব কী করে বলুন!

তা বটে।

লোকটা বিদেয় হল বটে, কিন্তু পুতুলটার কথা হরি সামন্ত ভুলতে পারল না। এরকম জ্যান্ত পুতুল সে জন্মে দেখেনি। আহা, পুতুলটা কিনতে পারলে সে বাইরের ঘরের আলমারিটায় সাজিয়ে রাখত। সবাই দেখে ভারী অবাক হত।

কিন্তু পরের রবিবার লোকটা এসে বলল, বাবু পুতুলটা শেষ অবধি গোপেনবাবু কিনলেন না কেন?

হরি অবাক হয়ে বলে, সে কী হে! তা কিনলেন না কেন?

ব্যবসা জিনিসটাই এরকম কিনা। আজ রাজা তো কাল ফকির! তা গোপেনবাবু বললেন, তাঁর নাকি হঠাৎ একটা বড় রকমের লোকসান হয়েছে। এখন দু-হাজার টাকার পুতুল কেনার ক্ষমতা তাঁর নেই। বললেন, পুতুল তো ছাড়, আগামীকাল বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে কি না তাই সন্দেহ। তা পুতুলটা এখনো বিক্রি হয়নি। আপনি নিলে কিছু কমসমে ছেড়ে দেব।

তা কততে ছাড়বে বলে ভেবেছ বলো তো!

আপনি হাজার টাকা ফেললেই হবে।

ওরে বাবা! হাজার টাকায় পুতুল কি তোমার সস্তা হল? না বাপু, আমার এখনো ভীমরতি হয়নি যে, হাজার টাকা জলে দেব। দেখো গিয়ে গোপেনবাবুর মতো আর কোনো আহাম্মককে খুঁজে পাও কি না।

হরি সামন্ত বিরক্ত হয়ে ঘরে চলে এল। কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর পানের পিক ফেলতে বারান্দায় গিয়ে দেখল, ঠিক আগের রোববারের মতোই লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে আর বস্তার খোলা মুখটা দিয়ে সেই পুতুলটা উঁকি মেরে হরির দিকে চেয়ে যেন কিছু বলতে চাইছে।

হরির যেন মনে হল, পুতুলটার চোখ তাকে বলছে, আমাকে তোমার কাছে রাখবে?

হরির বিষয়ী মনটাও একটু দ্রব হল। তার দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে আছে। তবু তার কেন যেন মনে হচ্ছে এই পুতুলটা তার একটা হারিয়ে যাওয়া ছেলে। হরি আজ আর লোকটাকে ঘুম থেকে তুলল না। বেশি গরজ দেখালে বিপদ, লোকটা দাঁও মারার চেষ্টা করবে। তবে সে তক্কে তক্কে রইল। ঘণ্টাখানেক বাদে লোকটা ঘুম থেকে উঠলে সে বলল, পুতুলটা যদি হাজার টাকায় বেচতে না পারো তবে আমার কাছে এসো।

লোকটা ভ্যাবলা চোখে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর বলল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। স্বপ্ন দেখলুম, পুতুলটা মানুষের গলায় আমাকে বলছে, আমাকে তুমি এই বাড়িতেই রেখে যাও। তা বাবু, আমি ধর্মভীরু মানুষ, দুনিয়ার ভালোমন্দ তেমন বুঝি না, বিষয়বুদ্ধিও নেই। তাই ঠিক করেছি ও পুতুল আমি অমনি আপনাকে দিয়ে যাব। আপনাকে দাম দিতে হবে না।

হরি থতোমতো খেয়ে বলে, এমনি দেবে! তোমার তো তাতে লোকসান হবে বাপু!

ফিরিওলা লোকটা হেসে বলে, না কর্তা লোকসান কীসের? আমার লাভলোকসানের হিসেব আপনার মতো নয়। মন যাতে সায় দেয়, যাতে আনন্দ পায়, তাতেই আমার লাভ। হাজার টাকায় কি সেই আনন্দ কেনা যাবে কর্তা? নিন, এই পুতুলটা আপনার কাছেই রেখে দিন।

বিনিমাগনায় পুতুলটা পেয়ে আনন্দের চেয়ে অবাক ভাবটাই বেশি হল হরি সামন্তর। লোকটাকে কি পাকেপ্রকারে ঠকিয়ে দিল? লোককে ঠকাতে তার একটা আনন্দ হয় বটে, কিন্তু এখন সেই আনন্দটা হচ্ছে না কিন্তু। যাই হোক হরি সামন্ত পুতুলটা আলমারিতে রেখে দিল। বেশ পুতুল! সুন্দর পুতুল!

কিন্তু হঠাৎ তার বাড়ির লোক টের পেতে লাগল, হরি সামন্ত লোকটা যেন পালটে গেছে। বিষয়বুদ্ধি খুইয়ে বসেছে, তা নয়। কিন্তু আগে তার দয়াধর্ম বলে কিছু ছিল না, দানধ্যানের কাজও মাড়াত না, বাড়িতে ভিখিরি এলে তাড়িয়ে দিত, মানুষ দায়দফায় এসে হাত পাতলে মুখ ফিরিয়ে নিত। এখন আর তা নয়। হাত খুলে দানধ্যান করতে লেগেছে, পরের আপদে-বিপদে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভিখিরিরা এ বাড়িতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভিখিরিরা এ বাড়িতে আসা ছেড়েই দিয়েছিল, এখন আবার আসতে লেগেছে।

এমন অবস্থা হয়েছে যে তার বাড়ির লোকই এখন হরি সামন্তকে যেন ঠিক চিনে উঠতে পারছে না। হরি সামন্ত নিজে বেশ মনের সুখেই আছে। আজকাল তার খিদে হয়, ভালো ঘুম হয়, বিষয়চিন্তা করতে করতে মনে আনন্দ বলে কিছু ছিল না, এখন মাঝে মাঝে তার আনন্দও হচ্ছে। তবে একটাই দুঃখ। সে ঠিক করে রেখেছে, সেই পুতুলওলাটা এলে তাকে বলবে, এই বয়সে তোমাকে আর কষ্ট করে ফিরি করে বেড়াতে হবে না। তুমি আমার কাছেই থেকে যাও, তোমার জন্য থাকার ঘরও ঠিক করে রেখেছি। তা সত্যি বাড়ির একটা ঘর ফিরিওলার জন্য সাজিয়েও রেখেছে বটে হরি সামন্ত।

কিন্তু ফিরিওলা অনেকদিন হল আসছে না। কী হল কে জানে! তবে এলে আর তাকে ছেড়ে দেবে না হরি সামন্ত। সে তৈরি হয়ে আছে মনে মনে।

দিন যায়, ফিরিওলা আসে না। ফিরিওলা আর আসে না।

বিশ্বযুদ্ধ

এক

ভিড়ের ভিতরে এক-আধটা অচল সিকি বা আধুলি চলে যায়। কে আর অতটা খুঁটিয়ে দেখছে! বিশেষতঃ ভীড়ের মধ্যে কন্ডাক্টর যখন নিজেই টালমাটাল, গেট-এর কাছে ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো লোকগুলোর কে যে ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার তালে আছে সেই দিকেই তার চোখ, তার ওপর স্টপে স্টপে লেডিজ-এর নামা-ওঠার জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে সে বিরক্ত—সে সময়ে সে বড়জোর হাতে পাওয়া পয়সাটাকে এক নজর দেখে। তারপরেই টিকিট আর খুচরো ফেরত দিয়ে ছাড়বার ঘণ্টি বাজায়। দু-কদম এগিয়ে আর একজনকে বলে দাদা আপনারটা হয়েছে? কাজেই চলে যায় এক আধটা অচল আধুলি বা সিকি। কে অত খেয়াল করে! একটা দুটো-তিনটে ট্র্যানজ্যাকশন কিংবা তারও বেশি চলে যায় অচল মুদ্রা। ঠিক সেইরকম ভিড়ের মধ্যে কেউ কাউকে ঠিকমতো দেখে না বলেই—কিছু কিছু অচল মানুষ চালু থাকে। অনেকদূর পর্যন্ত চলে যায় তাদের ট্র্যানজ্যাকশন। তারা বিয়ে করে, ছেলেপুলেও হয়।

আধুলিটা চলেই গেল। কন্ডাক্টর খেয়াল করল না। হাতে ফেরত এল পঁয়ত্রিশটা পয়সা আর পনেরো পয়সার একখানা টিকিট। বেশ তৃপ্তি বোধ করেন রামচন্দ্র রায়। অচল পয়সা জেনে-শুনে চালানোর বেপরোয়া ভাব। ধরা পড়লেও আবার একটু অভিনয়।

—এটা পাল্টে দিন।

—কেন?

—সীসে মশাই।

তখন ভ্রূ কুঁচকে 'কই দেখি' বলে উল্টে-পাল্টে সেই চেনা মুদ্রাটিকে দেখা। 'যত সব ঠকবাজ' বলে অনির্দিষ্টভাবে একজনকে গালাগাল দিয়ে পয়সাটা পাল্টে দেওয়া।

রামচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন সেই অভিনয়ের জন্য। মনে মনে মহড়াও দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছোকরা কন্ডাক্টর পয়সাটা একবার দেখল মাত্র। পরীক্ষা করার সুযোগ ছিল না। চলে গেল আধুলিটা। একটা ট্র্যানজ্যাকশন।

ত্রিশবছর আগে এত ভিড় ছিল না। একথা সবাই জানে। কিন্তু সবাই কি জানে যে ত্রিশ বছর আগে এত সহজে অচল পয়সা চলত না। বোধহয় মানুষ তখন পয়সা উল্টে-পাল্টে দেখার সময় পেত। বোধহয় লেন-দেন কম ছিল বলে মানুষের হাত দিয়ে মুহুর্মুহু পয়সা এখনকার মতো চলত না। তখন মানুষ পয়সার সৌন্দর্য দেখতে জানত বোধহয়। নাকি, এখনকার চেয়ে, তখনকার মানুষের অনুভূতিপ্রবণতা বেশি ছিল! পয়সা হাতে ছুঁয়েই তারা টের পেত কোনটা চালু, কোনটা নয়। কে জানে! ত্রিশ বছর আগে রামচন্দ্রের বয়স ছিল তেরো। এবং সেই বয়সে রামচন্দ্র পয়সা তেমন চিনতেন না। কারণ, ত্রিশ বছর আগে তেরো বছর বয়সেও মানুষের শৈশব থাকত। তাদের জন্য কেনাকাটা করতেন অভিভাবকরা। রামচন্দ্রের বাবা হরিশচন্দ্র অচল পয়সা

চিনতেন, জানতেন হিসেব লিখতে, আর কখনো ঠকতেন না। তাঁর গোল ফ্রেমের রোল্ডগোল্ডের চশমার পিছনে একজোড়া পরিষ্কার চোখ ছিল—সে চোখে ঘটনাপ্রবাহের স্বচ্ছ ছায়া বা প্রতিবিম্ব পড়ত। সন্ধ্যের মুখে বাজার করতে গিয়েও তিনি কখনো কানা বেগুন ব্যাগে তুলে আনেননি। রামচন্দ্র ভেবে পান না ত্রিশ বছর আগে মানুষের কি ছিল! কিন্তু কিছু একটা ছিলই, যা এখনকার মানুষদের নেই। তবে একথা ঠিক যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের এত ঘষাঘষি তখন ছিল না। ঘষাঘষিই কি মানুষের সহজাত অনুভূতিকে একটু ভোঁতা করে দেয়?

অনেকক্ষণ আধুলিটির জন্য একরকম আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন রামচন্দ্র। পরশুদিন থেকে ওটা তার নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে একটা ছিল। ব্যাপারটা প্রথম ধরেন তার স্ত্রী। কয়লাওয়ালাকে পয়সা দিতে গিয়ে ফিরে এসে বললেন—এটা পাল্টে দিতে বলছে। দ্যাখো তো, অচল নাকি!

অচলই। চিন্তিত মুখে রামচন্দ্র বললেন—তাই দেখছি। রেখে দাও পকেটে, ট্রামে-বাসে কোথাও চলে যাবে।

স্ত্রী নিঃসংশয় মুখে মৃদু হেসেছিলেন। রামচন্দ্রের ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে।

'লেডিজ সিট, লেডিজ সিট' বলে কন্ডাক্টর চেঁচায়। রামচন্দ্র জানালার ধারে সিট থেকে বাইরের দিকে চেয়ে হাতিবাগানের মোড়ে একটা সিনেমা হল-এর গায়ে বিশাল হোডিংয়ে সুন্দর একটা মেয়ের মুখ দেখছিলেন। দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল—তেতাল্লিশ বছর বয়সে বাঙালিরা বুড়ো। তাঁর শালা চূণী কিছুদিন জার্মানিতে হাতুড়ি পিটিয়ে এসেছে, গত একবছর ধরে সে কেবল তার জার্মানির গল্প একে ওকে শোনায়। সে প্রায়ই বলে—'জামাইবাবু, ওদেশের লোক চল্লিশ বছরের পর বিয়ে-শাদীর কথা ভাবে, আর তার আগে পর্যন্ত ফূর্তি লোটে এন্তার। সে যে কী ফূর্তি! জাইবাউ!' শেষ দিকে চূণীর মুখ রসস্থ হয়ে যাওয়ায় পুরো 'জামাইবাবু' কথাটা উচ্চারণ করতে পারে না, গল গল করে হাসতে থাকে। কথাটা প্রাণে লেগে আছে রামচন্দ্রের। তেতাল্লিশ বছর বয়সটা যে কিছু না—সেইটে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। ঘাড়টা একটু কেতরে, ঘুরিয়ে তিনি হোডিংয়ে সুন্দর মুখখানা দেখতে দেখতেই ওই চিৎকার শুনলেন। টারমিনাস থেকেই উঠেছেন রামচন্দ্র—সেই বাগবাজার থেকে, লেডিজ সিটের আওতা ছেড়ে যতদূর সম্ভব এগিয়ে বসেছেন, তবু ওই চিৎকার শুনে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সিটের ওপরের দিকটায় চোখ তুললেই অবাক এবং বিরক্ত হয়ে দেখলেন ইংরিজিতে লাল অক্ষরে 'মহিলা এবং শিশু' লেখাটা তার দিকে চেয়ে আছে। দোষটা তাঁরই, দেখে বসেননি। দোতলা বাসের নীচের তলাটা এরা ক্রমেই 'লেডিজ স্পেশাল' করে দিচ্ছে। না, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না। আর তার বাবা হরিশচন্দ্র এই ঠিক ভুলটা অবশ্য করতেন না। 'দেশে মেয়েছেলের অভাব নেই' বিড় বিড় করে এই কথা বলতে বলতে লো প্রসারের আরামপ্রিয় শরীরখানা ঠেলে তুললেন রামচন্দ্র, খাওয়ার পর এক ঘটি জল খেয়েছিলেন, সেই জল গলা পর্যন্ত ঢক ঢক করে উঠল। ভিড় ফুঁড়ে যে দুটো মেয়েছেলে এল তাদের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, তারপর আবার বিড় বিড় করে বললেন— অভাব কেবল সুন্দর মেয়েছেলের। বলে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

অচল আধুলি কিংবা লেডিজ সিট—সব ব্যাপারেই তাঁর হরিশচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়বেই। ত্রিশ বছর আগে তেতাল্লিশ বছর বয়সের হরিশচন্দ্র এইসব ভুলভ্রান্তি করতেন না। তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়নি, গঙ্গায় ইলিশ আসত এবং আনাজপাতিতে কেমিক্যাল সারের গন্ধ পাওয়া যেত না। হরিশচন্দ্র রায়ের রোল্ডগোল্ডের চশমার ফ্রেমের পিছনে একজোড়া পরিষ্কার চোখ ছিল। মাদ্রাজি নারকোলের মতো লম্বাটে মাথাটির ভিতরে ছিল শীতল চিন্তাশক্তি। তেতাল্লিশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি বাগবাজারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটা সম্পূর্ণ করেন, দুটো গম-পেষাই কল করেন এবং একটি গোপন কিন্তু ফলাও বন্ধকী কারবার খোলেন। এমন কি জজ কোর্টের উকিল হরিশচন্দ্র চিৎপুরে একটি সুন্দরী রক্ষিতাকেও মাসোহারা দিতেন। এর ফলে কিছু কথা উঠেছিল ঠিকই, তবু রামচন্দ্রের মা ও বাবার সম্পর্ক ভালোই ছিল। হরিশচন্দ্রের দূরদৃষ্টির কথা ভাবলে রামচন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। রক্ষিতাটির কথাই ধরা যাক। যখন আত্মীয়-স্বজনরা এসে

হরিশ্চন্দ্রের স্বভাবদোষের কথা বলাবলি করতেন, তখন সেই ছেলেবেলায় রামচন্দ্রেরও ভারী মন খারাপ লাগত। কিন্তু এখন, তাঁর নিজের বয়স যখন তেতাল্লিশ তখন রামচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে দেখে হরিশ্চন্দ্রের রক্ষিতা রাখার প্রয়োজনটাও খুবই স্পষ্ট বুঝতে পারেন। তিন নম্বর বাচ্চার পর গিন্নি কোলবালিশের মতো আগাপাশতলা সমান হয়ে গেছেন, মুখখানায় চর্বির জোয়ার, নাক মুখ চোখ খুঁজে বের করতে হয়। যৌবনোচিত কাজকর্মের কথা তুললে গিন্নি শীতল মনোভাব দেখান। এই থেকেই এ সব বয়সে বাঙালি ঘরে অশান্তি শুরু হয়। হরিশ্চন্দ্র সে অশান্তিকে দূরে রাখতে পেরেছিলেন। বন্ধকী সোনার গয়না আর গঙ্গস্নানে মাকে খুশি রেখেছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টির আরেক প্রমাণ আছে। নিজের ভবিষ্যৎ বোধহয় সিনেমার মতোই দেখতে পেতেন। নিজের মৃত্যুও। তেতাল্লিশ বছর বয়সেই তিনি বাড়ির দোতলায় উঠে একতলায় দু-ঘর ভাড়াটে বসালেন, হঠাৎ গম-পেষাই কল দুটো বিক্রি করে নগদ টাকা তুলে ফেললেন, বন্ধকী কারবার গুটালেন, স্ত্রীর সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করলেন, একজন আর্টিস্টকে দিয়ে নিজের একখানা চমৎকার অয়েলপেইন্টিং করিয়ে বৈঠকখানায় টাঙিয়ে দিলেন। তারপর মারা গেলেন। কিন্তু এমনই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেই মৃত্যু যে পরিবারটার কোন কষ্টই হল না।

রড ধরে দাঁড়িয়ে দোল খেতে খেতে লাল অক্ষরে লেখা 'লেডিজ অ্যান্ড চিল্ডেরেনে'র দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র ভাবেন, তিনি কি অন্ধ? তিনি কি হরিশ্চন্দ্র রায়ের সন্তান? বাবার সেই দূরদৃষ্টি তাঁর কই! এখনো, এই তেতাল্লিশ বছর বয়সেও তাঁর হাতে অচল মুদ্রা চলে আসে। টারমিনাসেও লেডিজ সিটে বসে পড়েন ভুলে, এবং আশ্চর্যের বিষয়—সিনেমার হোর্ডিংয়ে মেয়েছেলের মুখ দেখেন। চূণীর কাছে জার্মানির সমুদ্রতীরে রোদে পড়ে থাকা ছাল-ছাড়ানো খাসীর মতো হুমদো মেয়েছেলে দেখার গল্প শোনেন হাঁ করে। নিজেকে তাঁর অবিকল একটি অচল মুদ্রা বলে মনে হয়। লোকের অন্যমনস্কতার সুযোগে সংসারে চালু আছেন। কয়েকটা ট্র্যানজ্যাকশনের পরই শেষ হয়ে যাবেন।

সব কিছুর জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে দায়ী করতে তাঁর ভালো লাগে। ওই যুদ্ধটাই তাঁর সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের এই তফাতের কারণ। হয়তো ওই অ্যাটমবোমটাই মস্তিষ্কে, চোখে, দূরদৃষ্টিতে এইসব গোলমাল ঘটাচ্ছে।

স্ত্রীর অবশ্য তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস। অচল আধুলিটা যে তিনি চালাতে পারবেন তা যেন স্ত্রী ধরেই নিয়েছিলেন। এরকম ছোটখাটো কৃতিত্ব তাঁর কয়েকটা আছে। যেমন, বাড়িটা। দু-ভাইয়ের নামে বাড়ি। রামচন্দ্র আর বামচন্দ্র। বামচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই বাউন্ডুলে। অল্পবয়সে মদ ধরে, রেস খেলে একশা। তার ওপর বিয়ের বছর পাঁচেক বাদে খবর বেরোল যে সে আর একটা বিয়ে করেছিল বছর ছয়েক আগেই। সেই বউ বাড়ি বয়ে এসে খুব চেঁচামেচি করে গেল একদিন, সঙ্গে দু-তিনটি ছেলেপুলে। এইসব কারণেই ধারকর্জে তলিয়ে গিয়েছিল রামচন্দ্র। পাওনাদাররা যখন পুলিশে দেয় সে সময়েই রামচন্দ্র নগদ ছ'হাজার টাকা দিয়ে বামচন্দ্রের অংশ নিজের নামে লিখিয়ে নেন। বামচন্দ্র সেই টাকা পেয়ে কিছু ধার শোধ করে। কিছু ফূর্তি করে ওড়ায়। বছর খানেক পরে রামচন্দ্র তাকে সপরিবারে তুলে দেন। খোলামেলা বিশাল দোতলাটা তখন তাঁর একার। নীচের পুরোনো ভাড়াটে তুলতে কিছু কম করেননি রামচন্দ্র, ভূতের ভয় দেখিয়েছেন, মেথরকে পয়সা দিয়ে রাত-বিরেতে গু ঢালিয়েছেন বারান্দায়, গুণ্ডা লাগানোর ভয় দেখিয়েছেন এবং অবশেষে বিরক্ত হয়ে তারা উঠে গেছে। বাবার আমলে চল্লিশ টাকা ভাড়া ছিল, এখন সেখানে আড়াইশো করে দুটো ফ্ল্যাট থেকে পাঁচশো টাকা ইনকাম। মাদ্রাজি ভাড়াটে। খুব গোপনে বাবাকেলে বন্ধকী কারবারটা আবার খুলেছেন তিনি। দু-একটা টাকার মুখ দেখেছেন, দু-চার রতি সোনা থেকেও যাচ্ছে। সেই কারণেই তাঁর ওপর স্ত্রীর অগাধ বিশ্বাস।

কিন্তু নিজেকে তেমন বিশ্বাস করেন না রামচন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় তিনি কিছুই না। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সেই হরিশ্চন্দ্র বাগবাজারে প্রকাণ্ড বাড়ি হাকিয়েছিলেন, তেষট্টি বা তিয়াত্তর পর্যন্ত টিকে থাকলে মনুমেন্ট বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে ছাড়তেন। আর রামচন্দ্র এখনো পৈতৃক বাড়িতে পড়ে আছেন, বামচন্দ্র মাঝে মাঝে মদ খেয়ে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পাড়ার লোকজনকে জানিয়ে গালাগালি দিয়ে

যায়; পুরনো ভাড়াটে বেনামা চিঠিতে নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দেয়। এইসব উঞ্ছবৃত্তি করে তাঁকে টিকে থাকতে হচ্ছে। ওই বয়সেই হরিশ্চন্দ্রের রক্ষিতা, আর রামচন্দ্র সেই বয়সে এখন সিনেমার হোডিংয়ে দেখে আর চূণীর রসস্থ মুখে শুনে মেয়েছেলের আস্বাদ নেন। বন্ধকী কারবারে হরিশ্চন্দ্র পড়তি জমিদার কি উড়নচণ্ডী বড়লোকের ছেলে ধরে এই বয়সেই পঞ্চাশ-ষাট ভরি ঘরে তুলেছিলেন, রামচন্দ্র বড়জোর পিতলে আংটি, পাতলা দুল, সুতোর মতো হার—কয়েকটা এরকম ফঙ্গবেনে জিনিস ঘরে তুলেছেন। না, নিজের ওপর রামচন্দ্রের বিশ্বাস নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটাই সব নষ্টের গোড়া। ত্রিশ বছর আগে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়নি তখন যে অমনোযোগী, অসতর্ক বা অন্যমনস্ক মানুষ ছিল না, তা নয়। ছিল। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র রায় তা ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেরা পাছে বাপের অয়েলপেইন্টিং করতে গিয়ে ঠকে যায় সেই ভয়ে তিনি নিজের অয়েলপেইন্টিং করে রেখে যান। তাঁর ছেলে হিসেবে রামচন্দ্রেরও অসতর্ক বা অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। তবু যে তিনি অসতর্ক এবং অন্য মনস্ক তার কারণ বোধ হয় এই যুদ্ধটা। সীটের ওপর লাল অক্ষরে লেখা 'লেডিজ অ্যান্ড চিল্ডরেন' দেখে তিনি নিজের জিব কামড়ালেন। সত্যিই কি তিনি হরিশ্চন্দ্রের সন্তান? নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই তার পিতা?

অথচ আশ্চর্য এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা তাঁর লড়াই ছিল না।

হাতদুটো ভেরে গেছে। এসপ্ল্যানেড থেকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি টের পাচ্ছিলেন হাত দুটোর সাড় নেই। মাথা ঝিম ঝিম করছে। পা একটু একটু কাঁপছে। লো প্রেসার। প্রেসার থাকলে সেটা লো থেকেই হাই হতে সময় লাগে না। চাপটা থাকবেই! তেতাল্লিশেই গিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্র। সেটা ভাবলে বুকটা কেমন চাপ ধরে যায়। আবার ভাবেন, হরিশ্চন্দ্রের কিছুই তো তিনি পাননি, তেতাল্লিশের ফাঁড়াটা কি আর পাবেন?

হিন্দুস্তান বিল্ডিংসের পিছনের অ্যানেক্সে তাঁর অফিস। এয়ার-কন্ডিশনড। প্রাইভেট আমলে ঢুকেছিলেন রামচন্দ্র। চাকরিটা তখন চাকরিই ছিল। পাঞ্চিং মেশিন সারাদিন হড় হড় করে চলত। একদিন পৌনে পাঁচটায় মেশিন বন্ধ করে হাত ধুয়ে এসেছিলেন বলে ইনচার্জ হালদার তাঁকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন। সেই দিন আর নেই। এখন এগোরোটায় চা দিয়ে যাওয়ার পর কর্মচারীরা কাজে হাত দেয়। টিফিনে ফিশ খেলার আসর বসে। তিনটে থেকে অফিসের ভাঙন শুরু হয়। মাইনে বাড়াতে কিছু কষ্ট করতে হয়নি। বছর বছর বেড়ে যায়। চারশোতে ঢুকেছিলেন। বিনা আয়াসে এখন সাতশোর কিছু উপরে পান।

অফিসে এসে একটু বিশ্রাম নিলেন রামচন্দ্র। ডানা দুটোয় সাড় নেই যেন। পা দুটো সেইরকমই কাঁপছে, মাথাটা ঝিমঝিম। এক গ্লাস জল খেলেন। পাশেই ভটচায। জিগ্যেস করলেন—বোনের বিয়ে হয়ে গেল?

—আপনি গেলেন না!

—ক'দিন ধরেই শরীরটা ভালো নেই হে ভটাচায, কেমন যেন সব ভুল-ভাল হয়ে যাচ্ছে।

ভটচায চোখ তুলে বলে—কীসের ভুল-ভাল?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামচন্দ্র বললেন—কে যেন একটা অচল আধুলি গছিয়ে দিল সেদিন, লেডিজ সিট না দেখে বসে পড়লাম বাসে আজ। এসব কেন হচ্ছে বলো তো! ব্যাটারা এত বেশি অ্যাটম বোমা ফাটাচ্ছে বলে নাকি! বলেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর কথাবার্তা কিছু আবোল-আবোল হয়ে যাচ্ছে। মনে যা আসে তা বলতে নেই। সে সব বলে পাগলেরা।

ভটচায চোখ গোল করে বলে—আপনার মতো প্র্যাকটিকাল মানুষের আবার এসব ভুল হয় নাকি।

—বয়স। বলে চুপ করে থাকেন রামচন্দ্র, তারপর আস্তে আস্তে কেবল নিজেকে শুনিয়ে বলেন—বয়স না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

—বয়স আর এমন কী? যা স্বাস্থ্যখানা রেখেছেন, আবার বিয়ে দিয়ে আনা যায়।

রামচন্দ্র হাসেন—চেহারা আর কী দেখলে! তেতাল্লিশে ওদেশের লোক তো সত্যি সত্যিই বিয়ে করে, ওদের স্থিরযৌবন।

—শীতকালের দেশ তো।

—তা হবে, বোনের বিয়েতে কী দিলে-থুলে?

—নগদই চলে গেল দু-হাজার, আর দশভরি গয়না, ফার্নিচার...

—ধার হয়ে গেল?

—হাজার চারেকের মতো।

খানিকক্ষণ এসব কথাবার্তা বললেন রামচন্দ্র, কিন্তু শরীরটায় যুৎ পাচ্ছিলেন না। কাজের তাড়া নেই, এজেন্টদের কমিশনের সময় পার হয়ে গেছে। সে সময়টায় একটু খাটনী গেছে, ইনচার্জকে গিয়ে বললেন—আজ আর মেশিনে হাত দিচ্ছি না।

—কেন?

—শরীর ভালো নেই।

ইনচার্জ ছোকরামত, হেসে বলল—বসে থাকুন। শরীর ভালো বোধ করলে করবেন।

হালদারের আমল কেটে গেছে। এখন চাকরি আর ঠিক চাকরি নেই, স্থুল স্ত্রীর মতোই অভ্যাসজাত, শীতল, এবং বিশ্বস্ত। তাই ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন রামচন্দ্র। স্ত্রী একজোড়া চপ্পল আনার জন্য কাগজে ডান পায়ের মাপ দিয়ে দিয়েছেন, একবার পকেট থেকে কাগজটা বের করে দেখলেন, ডান পায়ের ছবি, মাঝখানে লেখা—লাল রং এনো কিন্তু। কাগজখানা বার করে দেখলেন। আবার রেখে দিলেন পকেটে। মেয়েটার জন্য একটা আপেল নিয়ে যাওয়ার কথা। সেটা ভাবলেন। হরিচন্দ্র রায়ের আয়েলপেইন্টিটাও মনে পড়ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাও। ত্রিশবছর আগেকার পৃথিবীর কথা ভাবতে ভাবতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হরিশ্চন্দ্র রায়ের কথা ভাবতে ভাবতে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুই

যতদূর মনে পড়ে, তিনি এসপ্ল্যানেড থেকে একটা চলন্ত বাসে উঠবার চেষ্টা করছিলেন। নিউমার্কেটের উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে স্ত্রীর জন্য সস্তায় একজোড়া চপ্পল কিনেছেন, সেই জুতোর বাক্স বাঁ বগলে, বাঁ হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় রাঙা একটা আপেল। এইসব নিয়ে তিনি একটা বাসে হান্ডেলে ডান হাতে ধরে পা-দানীতে উঠে পড়েছিলেন, রোজ যেমন যান। কিন্তু রোজ তো সবার সমান যায় না। এক-একটা দিন আসে যা অন্য সব দিনের থেকে আলাদা। পা-দানীতে উঠে গেছেন, ভিতর থেকে একজন তখন স্টপ ভুল করায় তাড়াতাড়ি নেমে আসছে। ধাক্কাটা জোরেই খেলেন রামচন্দ্র, দু-হাত তুলে বাতাস ধরলেন, তারপর কিছু মনে নেই।

একটুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য জ্ঞান ফিরল। দেখেন এক দোকানের সিঁড়িতে শুয়ে আছেন। চারদিকে লোকজন জমে গেছে। তাঁর চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া হচ্ছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসে জিগ্যেস সরলেন—কী হয়েছে?

ভিড় থেকে একজন বলল—তেমন সিরিয়াস কিছু না। বাস থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, জোর বেঁচে গেছেন।

তিনিও বুঝতে পারলেন, তেমন কিছু হয়নি। মাথার পিছনটা ব্যথা করছে, কনুই দুটো ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে, বুকে একটু ধুকুপুকুনি, অল্প একটু শ্বাসকষ্ট। এ ছাড়া তেমন কিছু না।

একটা বাচ্চা ছেলে একপাটি চটি কুড়িয়ে এনে বলল—এটা বোধহয় আপনার। তাঁরই। চটি পায়ে দিয়ে উঠলেন, পকেট দেখলেন, সব ঠিক আছে। মানিব্যাগ, রুমাল, চাবি, বুকপকেটে কলম, হাতে ঘড়ি। কিছুই খোয়া যায়নি।

এমনকী আপেলটাও পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোক সহৃদয় ভাবে ঠোঙাটা কুড়িয়ে এনে দিলেন—এ আপেলটা বোধহয় আপনারই, বাড়ির কারো জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন!

তিনি আপেলটা নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দেন। একজন জুতোর বাক্সটা কুড়িয়ে এনে দেয়। তাকেও ধন্যবাদ দেন। মানুষ কত ভালো—এই কথা ভেবে তিনি ওঠেন। তারপর স্বাভাবিক মানুষের মত বাস-স্টপে গিয়ে

দাঁড়ান। বাঁ-বগলে জুতোর বাক্স, বাঁ-হাতে আপেলের ঠোঙা। হাতে হাতঘড়ি এখনো চলছে টিকটিক। পকেটে মানিব্যাগ, রুমাল, চাবি। সব ঠিক আছে, একটা বাসও আসছে।

বাসে উঠতে যাবেন, হঠাৎ খেয়াল হল—আরে! আমার বাসের নম্বর কত? মনে পড়ছে না তো!

পিছিয়ে দাঁড়ালেন, মনে করবার চেষ্টা করলেন। তখন পর পর কতগুলি প্রশ্ন তাঁর মনে ছ্যাঁকা দিয়ে গেল—আমার বাসের নম্বর কত? আমি কোথায় থাকি? আমি কোথা থেকে আসছি? আমি কে?

অবাক—খুবই অবাক হয়ে দেখলেন, প্রশ্নপত্রটি খুবই কঠিন। আউট অফ সিলেবাস। একটা উত্তরও তার জানা নেই, নিজের নাম-পরিচয়ের জন্য তাড়াতাড়ি মানিব্যাগ খুললেন তিনি, যদি কোন চিরকূটে লেখা থাকে।

মুক্ত গদ্য

কখনো পাখি, কখনো বাসা

টেঁপির সঙ্গে পাঁচুর প্রেম তো আজকের ব্যাপার নয়। বহুকাল ধরেই ঘটে আসছে। কখনও তাঁদের নাম ছিল আদম ও ইভ বা রোমিও ও জুলিয়েট, লায়লা এবং মজনু, রাধা এবং কৃষ্ণ বা নিতান্তই রামী এবং চণ্ডীদাস। কেউ কেউ বলেন, ওরাই ঋজি আর রিচি, প্রকৃতি আর পুরুষ।

কিন্তু টেঁপির সঙ্গে পাঁচুর বিয়ে হয়তো হল না। টেঁপির বাবা ধরে বেঁধে তার বিয়ে দিল তেলকলের মালিক জনার্দনের সঙ্গে। দেখা গেল, পাঁচ বছর বাদে টেঁপি দিব্যি খোকাখুকি, শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ডেঁড়েমুশে সংসার করছে। পাঁচুও বলতে নেই, টেঁপির বিয়ের পর কিছুদিন হু-হু বুক আর রুখু মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে শেষ অবধি একটা চাকরি জুটিয়ে একদিন টোপর পরে ফেলল। বছর না ঘুরতেই ঘরে শব্দ উঠল, ট্যাঁ।

পৃথিবীর জনসংখ্যা ঠিক এইভাবেই বাড়ে। শোপেনহাওয়ারমশাই একথাটাই বলতেন, বাপু হে, প্রেম থাক বা না থাক, নরনারীকে নানা মোহ আর রোমহর্ষে প্ররোচিত করে প্রকৃতি ওই একটি কাজই আদায় করে নেয়।

রিপ্রোডাকশন। প্রেম থাকলেও বাচ্চা হবে, না থাকলেও হবে। শোপেনহওয়ার প্রেমকে ল্যাটা বলেননি বটে, কিন্তু যথেষ্ট হ্যাটা করেছেন, সন্দেহ নেই। এই লিভিং টুগেদারের যুগেও তাঁর মতামতকে বেশ আধুনিক মনে হয়।

এখন কামে আর প্রেমে যখন একটা মহা ভজখট্ট লেগে গেছে, কোনটা কী তা যখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, এবং পশ্চিমের শ্রদ্ধেয় সাহেবগণের হোঁৎকা শরীরের চাপে প্রেম যখন নাভিশ্বাস তুলে চিঁচিঁ করছে, তখন অর্থাৎ তার অভিপ্রেত মৃত্যু ঘটবার অনতিপূর্বেই প্রেম বস্তুটির একটা ব্যবচ্ছেদ হওয়া ভালো। আসলে সে ছিল কিনা কোনোদিন সেই প্রশ্নটাই ভাইটাল। সে আছে কিনা আদৌ সেই গুরুতর প্রশ্নও উঠবে। কামের অস্তিত্ব বিষয়ক কোনও ঝামেলা নেই, প্রমাণের অপেক্ষাও সে রাখে না। সে ছিল, আছে, অবশ্যই থাকবে। কিন্তু বেচারা প্রেম? সে তো ভাবের ঘুঘু, ঝোপের পাখি, হাওয়ার নাড়ু, কিংবদন্তীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মসলিন, নেই-মামা, অশ্বডিম্ব। সে ছিল কিনা, আছে কিনা তা কে বলে দেবে আমাদের? হাতের ছাপ ফেলে যায়নি, রেখে যায়নি অন্য কোনো সূত্রও। শার্লক হোমসমশাইও আতসকাচ নিয়ে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলে উঠতে পারেন, ভায়া ওয়াটসন, এই একটা রহস্য যার কিনারা স্বয়ং শার্লক হোমসেরও সাধ্যের বাইরে। একজনকে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিনি যে প্রায় সেই বাল্যকাল থেকে অতিশয় ঘন ঘন এর-ওর-তার প্রেমে পড়ে যেত। নানা বালিকা বা কিশোরীর নানা রকমের আকর্ষণ কারও চোখ ভালো, কারও হাসি সুন্দর কারও গানের গলা দারুণ মিষ্টি। একসঙ্গে বহুজনের প্রেমে পড়ে যেতে কোনও বাধাই তো নেই। এই ক্রমান্বয়ে প্রেমে পড়ে যেতে থাকা থেকে সে কিন্তু পরেও রেহাই পায়নি।

সভয়ে সত্যি কথাটা বলতেই হয়, পুরুষেরা যথাযথ একগামী নয়। বহুগামিত্ব তারা সেই আরণ্যক যুগ থেকে রক্তে বহন করে আসছে। কোনও নারীর জন্য যখন সে উন্মাদ হয় তখন তার ণত্ব ষত্ব জ্ঞান থাকে না ঠিকই, তাকে না পেলে হয়তো আত্মহত্যা করে, মদ খায়, সাধু হয়ে যায়, বিপ্লবীদের দলে নাম লেখায়, দেশের কাজে নেমে পড়ে, কবিতা লিখতে শুরু করে বা পাগলও হয়ে যায়। তবু বলি, এহ বাহ্য। সেই নারীকে সে লাভ করলেও কিছুদিনের মধ্যেই অন্যতর মহিলাদের প্রতি তার ছোঁক ছোঁক করার প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দেখা দেয়। মহিলারা কতটা গুরুতরভাবে প্রেমে পড়ে যেতে পারেন তা বলা শক্ত। কোনও মহিলা আজ অবধি আমার প্রেমে পড়েননি বলে এ বিষয়ে আমার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তবে শুনেছি তারাও যখন পড়েন তখন সাংঘাতিকভাবেই পড়েন এবং ণত্ব ষত্ব জ্ঞান তাঁদেরও থাকে না। পুরুষদের মতো তাঁরা হ্যাংলা নন বলেই এরকম ঘটনা আকছার ঘটে না, এই যা।

ভালোবাসা কথাটার অর্থ, যাকে ভালোবাসা যায় তার ভালোতে বাস করা। অর্থাৎ তার যাতে যতটা ভালো হয় তাই করা। এই তত্ত্বের মধ্যে কাম বলে কোনও বস্তুই নেই। এই বিংশ শতকের শেষভাগে ক্ষয়িষ্ণু মানবতাবোধ, খণ্ডিত দৃষ্টি ও হৃদয়বত্তায় দেউলিয়া মানুষের পক্ষে এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা শক্ত। এই ভালোবাসার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় বাৎসল্যে আর পাওয়া যায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দম্পতির মধ্যে কখনো-সখনো।

কৈশোরে যৌবনে প্রেমে পড়া বা প্রেম হওয়ার মতো সহজ আর কীই বা হতে পারে! কিন্তু সেই অঘটন অনেকটাই ফেনিল, ফাঁপানো এবং ক্ষণস্থায়ী। যদি রোমিওর সঙ্গে জুলিয়েটের বিয়ে হয়ে যেত তাহলে যেমন একটি অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম তেমনি অন্যদিকে হয়তো দেখা যেত, রোমিও আর জুলিয়েটের মধ্যে চুলোচুলি ঝগড়ার চোটে বাড়িতে কাকপক্ষী বসতে পারছে না। রোমিও হয়তো ভিন্ন মহিলার প্রতি গোপন প্রণয়ে মত্ত হয়ে পড়ত। জুলিয়েট বেচারী চোখের জলে রুমালের পর রুমাল ভিজিয়ে ফেলত। কে জানে কী হত। সোডা, বীয়ার বা শ্যাম্পেনের বোতল খুলবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভসভসে ফেনা উপচে পড়ে রোমান্টিক ভালোবাসা ঠিক ওরকম।

তারপর থিতোয়, লেভেল নামতে থাকে তলার দিকে। নামতে নামতে অনেক সময় তা লোপাট হয়ে যায়, অনেক সময় তলানী একটু থাকে। আর যদি মিলন না ঘটে তবে অনেকদিন অবধি সুগন্ধীর শূন্য শিশির মতো সুবাস একটু থেকেই যায়। একটু রেশ। বিরহান্ত প্রেম বুকে নিয়ে কত মানুষ তো আমৃত্যু নিঃসঙ্গ থেকে গেছেন। এক বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক আজও তার সাক্ষী। আদি মানব ও আদি মানবীর জন্মের পর থেকেই নানাভাবে রচিত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে তাদের সম্পর্ক। কখনো দেহগন্ধময়, কখনো ভাব-রহস্যে ভরা। আজও সেই একই গল্প বারবার কথিত হয়, বারবার ঘটে যায় সেই আদি ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। সাহেবরা রোমান্টিক প্রেমকে প্রায় কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়েছে, আর সেই তারই অভাববোধ থেকে গোগ্রাসে পড়ছে রোমান্টিক প্রেমের ফিনফিনে গল্প 'লাভ স্টোরি'। বারবারা কার্টল্যান্ডের বই যে লাখো লাখো বিকোয় তার কারণও কি নয় এই অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস!

দেহগন্ধহীন প্রেমকে এই যুগে বারংবার লাঞ্ছিত হতে দেখি। মেয়েদের শরীরের বিজ্ঞপ্তিতে ভরে গেল চারপাশ। পুরুষের পৌরুষ কমে গিয়ে বাড়ছে লোলুপতা। ওই ধ্যানের প্রেমকে কোন অস্থির হৃদয় পিঁড়ি পেতে বসতে দেবে? কার ধৈর্য আছে সারা জীবন ধরে সযত্নে পরিচর্যা করবে ওই বিরহ-ক্ষতের। গোপন ওই রক্তক্ষরণ যে আস্তে আস্তে হয়ে ওঠে ঝরা বকুলের মতো পবিত্র ও সুন্দর তা নিরীক্ষণ করার মতো অর্ন্তদৃষ্টি আর কোথায়? যার আছে সে বিরহান্ত প্রেমের টুপটাপ পুষ্পবৃষ্টি সারা জীবন ধরে উপভোগ করতে পারে। যন্ত্রসভ্যতার যত বাড়বৃদ্ধি হয় ততই কি কমে যায় মানুষের ভাবাবেগ? আজকাল শোক কমেছে, আবেগ কমেছে, বেড়ে গেছে হিসেবী বুদ্ধি। কত অনায়াসে এখনকার কিশোর-কিশোরীরা পরস্পরের সঙ্গে খোলামেলা মেলামেশা করে, পরস্পরকে তুই-তোকারি করে! অলিখিত একটা নীতিও আছে তাদের, বন্ধুকে বিয়ে করতে নেই। সেটা একরকম বিশ্বাসঘাতকতা। দুটো একটা ছুটছাট হয়ে গেলে বন্ধুরা দুয়ো দেয়।

মেয়েদের রহস্য পুরুষের কাছে, পুরুষের রহস্য মেয়েদের কাছে আর তা তেমন দূরের জিনিস নয়। রহস্য নেই বলেই সেই রোমহর্ষ নেই, নেই লজ্জারুণ থরোথরো প্রথম স্পর্শের বিদ্যুৎপ্রবাহ। দেহগন্ধহীন যে প্রেম শেষ অবধি শুভ্র ও উজ্জ্বল তা হল দম্পতির বিবাহিত জীবনের একেবারে শেষভাগে। যখন ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত এবং নিজস্ব পরিবারে সুস্থিত, মেয়েরা ভিন্নতর সংসারের কর্ত্রী, যখন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ছুটির সময় হল, তখন। 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার' দুজনের দুজন। তখন দুজনকে ঘিরে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসছে ক্রমে, পৃথিবীর সঙ্গে বাঁধন ছেঁড়ার সময় হল, পিছনে গোধূলির মতো বিস্মৃতির ভিতরে হারিয়ে গেছে পায়েচলা পথের মতো স্মৃতির রেখাটি। মনে পড়ে, কত কী মনে পড়ে, কত কী মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ে না। রণক্লান্ত দুটি প্রাণ তখন সত্যিই পরস্পরের কাছে কখনো পাখি, কখনো বাসা। তখন ভালোবাসা নিষ্কলঙ্ক, তুষার শুভ্র।

চানাচুরতন্ত্র

চানাচুরের সঙ্গে আমি ভারতীয় গণতন্ত্রের বেশ মিল পাই। এক মুঠো চানাচুর হাতের মুঠোয় নিয়ে যদি ভালো করে নিরীক্ষণ করা যায়, তা হলে গণতন্ত্র চিজটি কী, তা খানিকটা মালুম হয়। হয়তো ঝুরিভাজার বগলের তলা দিয়ে ডালমুট উঁকি মারছে বাদামের গা ঘেঁষে কিসমিস ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে, আধখানা কাজুর কোলে নিশ্চিন্তে বসে আছে, পাপড়ি, গাঠিয়ার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে লেগেছে কাঠিভাজা। মুখে ফেললেও বিচিত্র স্বাদ। টক, ঝাল, মিষ্টি গন্ধেও মিশ্র এক ককটেল। যেন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সব মিলেজুলে ভাই ভাই। আর ভাগ কি শুধু ধর্মে? কেউ তামিল, কেউ তেলুগু, কেউ মালয়ালি বা মারাঠি, পাঞ্জাবি বা বিহারি, বাঙালি বা অসমিয়া। ভাগ করতে বসলে নানা ক্যাটাগরিতে ভাগাভাগি শেষ হবে না। এত বিভাজন নিয়েও রবি ঠাকুরের ভাষায় ভারতের বিচিত্র জনগণ 'এক দেহে হল লীন।'

'লীন' কথাটা লক্ষ করে দেখলে মালুম হয় যে, লীন মানে 'বিলীন' নয়। অর্থাৎ চানাচুরের কাজু ডালমুট হয়ে যাচ্ছে না, চিনেবাদাম বাদামত্ব বিসর্জন দিয়ে কিসমিসে রূপান্তরিত হয়ে যায়নি বা কাঠিভাজা হয়ে যায়নি পাপড়ি। যে যার ধর্মে থিতু হয়ে আছে। কোনও আহাম্মক যদি মিক্সিতে ফেলে চানাচুরকে পেষাই করে, তা হলেই চানাচুরের সর্বনাশ এবং ধর্মনাশ। তাই গণতন্ত্রে একঢালা বন্দোবস্ত চলে না। কে কী খাবে, কী পরবে, কার উপাসনা করবে, তা তাকেই ঠিক করতে দেওয়া ভালো।

যে সারাক্ষণ বসে থাকে, তাকে যদি কেউ এসে বলে, 'ওহে, তোমাকে আগামী এক ঘণ্টা একদম চুপচাপ বসে থাকতে হবে', তা হলেই তার সমস্যা শুরু। ওই এক ঘণ্টা তার প্রবল উসখুস। তার বাথরুম পাবে, ছাদে যেতে ইচ্ছে করবে, হাঁটুতে ব্যথা হবে। অর্থাৎ, আপনমনে চুপচাপ বসে থাকা এক জিনিস। সেটা নিজের ইচ্ছাধীন। অন্য কেউ যেন কিছু চাপান দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে অনিচ্ছেরা চাগাড় দিয়ে ওঠে। সোজা কথা, হঠাৎ কেউ জবরদস্তি কোনও একটা অনুশাসন চাপিয়ে দিলে মানুষের নানা বিপন্নতা দেখা দেয়।

কথা ছিল, বেআইনি কসাইখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তা শুধু কসাইখানা কেন মশাই, বেআইনি, অবৈধ সব কিছুই তো বন্ধ করা উচিত। আর বেআইনি কসাইখানা বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশ-প্রশাসন সম্ভবত কর্তাকে খুশি করতেই বৈধ-অবৈধ নির্বিশেষে সব কসাইখানাই বন্ধ করে দিয়েছে। ত্রাহি রব ওঠারই কথা। উঠেছেও। আর ব্যাপারটা ছড়িয়ে গিয়েছে আরও কয়েকটা রাজ্যেও।

আদিতে, অর্থাৎ প্রস্তরযুগেরও আগে মানুষ আমিষাশী ছিল, না নিরামিষাশী? বলা শক্ত। বিশেষজ্ঞরা হয়তো জানেন। তবে অনুমান হয়, মানুষের দাঁত-নখের তেমন জোর না থাকায় এবং বাঘ-সিংহের মতো দ্রুত দৌড়নোর ক্ষমতার অভাবে শিকার করার সাধ্য তার ছিল না। আর বানরেরা তো আমিষাশী নয়ও। হয়তো ঘটনাক্রমে মানুষ সর্বভুক হয়েছে। আমিষ ধরেছে। নিরামিষও ছাড়েনি।

মানুষের হাল, গতিপ্রকৃতি কোন দিকে তা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু একটু হলেও নিরামিষের প্রতি প্রশ্রয় যে বেড়েছে, তা অনুমান করা যায়। কারণ আজকাল ডাক্তাররা রোগভোগের বিচিত্র ঠিকানা দেখে

মানুষকে মাঝে মাঝে নিরামিষাশী হতে বলেছেন। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে, নিরামিষ অনেকটা নিরাপদ আহার।

তবে, এ ব্যাপারে কোনও জবরদস্তি তো চলে না। ভালো কথাও চোখ পাকিয়ে বললে মানুষ উলটো অর্থ ধরে। আর ধর্মের দোহাই তো আরও অচল। সুতরাং যে যার ধর্মে থিতু থাকুক, গণতন্ত্রে এটাই কাম্য।

এ দেশটা একটু বিচিত্র। যাঁরা পশুক্লেশ নিবারণের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা দিব্যি মাছ-মাংস খান। যাঁরা কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি পোষ্যের জন্য জান-কবুল, তাঁরা যখন মাছ-মাংস খান, তখন ভুলে যান যে, অন্য কোনও পশুকে বধ করেই তাঁর মাংসের জোগান আসছে। এ দেশে প্রবল গাঁধীবাদী নেতারও প্রিয় ছিল পাঁঠার মাংসের ঝোল। তা এ সব তো হতেই পারে। আর সেই জন্যই গণতন্ত্রকে হজম করা বেশ শক্ত ব্যাপার।

ভ্রমণ

কুম্ভ জুড়ে মানুষের মন্থন

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধি হয়ে, ১৯৭৬-এ প্রথম যখন পুর্ণকুম্ভের মেলায় ইলাহাবাদের প্রয়াগে যাই, তখন আমি সাংবাদিক হিসেবে নতুন, কুম্ভমেলা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু এটা জানা ছিল যে, নিছক সাংবাদিকতার জন্য আমাকে পাঠানো হয়নি। সংবাদের চেয়েও বেশি কিছু আমার কাছে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কুম্ভমেলা শুধু সংবাদের উৎস তো নয়, তার তাৎপর্য আর একটু গভীর। প্রতিদিন তাই সকালবেলাতেই আমি অনেকটা হাঁটাপথ অতিক্রম করে, ভিড় ঠেলে হাজির হয়ে যেতাম গঙ্গাদ্বীপে, সাধুদের শিবিরে। বিস্তীর্ণ চর জুড়ে সাধুদের সারি-সারি আস্তানা। আর কত সম্প্রদায়ের কত রকম সাধু। জানি, কুম্ভের প্রাণই হল সাধু-সন্ন্যাসী। এ মেলায় তাঁরাই মুখ্য। সাধুদের বহিরঙ্গের কঠিন নির্মোক ভেদ করে ঘনিষ্ঠ হওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু চেষ্টায় কী না হয়! অচিরেই বিভিন্ন শিবিরের সাধুদের সঙ্গে আমার রীতিমতো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা নেমন্তন্ন করে তাঁদের সঙ্গে বসেই মধ্যাহ্নভোজনও করিয়েছেন আমাকে। দিনান্তে সুইস কটেজে ফিরে রোমান হরফে ক্যাপিট্যাল লেটারে লম্বা প্রতিবেদন লিখতে হত, তারপর সন্ধের মুখে অনেকটা লম্বা পথ হেঁটে গিয়ে ডাকঘরে টেলেক্স করে আসতে হত। পরদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র প্রথম পাতায় সেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হত। সাধুসন্ত ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ও আলাপচারিতার বিবরণও থাকত তাতে।

কুম্ভ বাস্তবিকই এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক মেলা। কুম্ভের পিছনে সমুদ্রমন্থনঘটিত যে-পৌরাণিক কাহিনিটি আছে, তা এখন সকলেই জানেন। সেই কাহিনির সঙ্গে এখনকার কুম্ভমেলাকে মেলানো যাবে না। শঙ্করাচার্য যে-উদ্দেশ্যে এই সাধুসঙ্গমের প্রচলন করেছেন, তাও হয়তো সর্বাংশে সফল হয়নি। সাধুদের সমন্বয় বা ঐক্য চেয়েছিলেন, তিনি, যা মত বিনিময় ও হার্দ্য আলোচনার মাধ্যমে হয়তো ঘটে ওঠার নয়। তবু বিচিত্রের সমাবেশ তো ঘটেছে।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ শাহিস্নানের দিন ইলাহাবাদ স্টেশনে ওভারব্রিজ ভেঙে পড়ায় হুড়োহুড়ি পদপিষ্ট হয়ে কুড়িজন মারা গিয়েছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কুম্ভমেলায় এই ঘটনা কিছুমাত্র অভিনব নয়। ইলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনা এবং অধুনালুপ্ত সরস্বতীর সঙ্গমস্থলের পাশেই কেল্লার মাঠে কুম্ভে যে, ভিড় আমি দেখেছি, তা অতীব বিপজ্জনক। কোনও কারণে উত্তেজনা ঘটলে ভীত ও উদ্বেল মানুষের শৃঙ্খলাহীন ছোটাছুটিতে যে-কোনও সময়েই এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে। ভারতে জনসমাবেশ সর্বদাই অনিয়ন্ত্রিত। মানুষের কৌলিক শৃঙ্খলাবোধের একান্তই অভাব। সকালবেলায় স্নানের সময় জলে এত মানুষ নেমে পড়ত, যে জল চোখে পড়ত না। স্নানেও দু-চারটে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যেত। এই ঘটনার প্রায় বারো বছর পর আমি ফের কুম্ভে যাই হরিদ্বারে। সঙ্গে ছিলেন কালকূট সমরেশ বসু, 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-র লেখক।

উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তব সর্বদা মেলে না। অমৃতকুম্ভের লেখক কালকুট তা ভালোই জানেন। তবু তাঁর 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'-র অন্য এক সর্বজনীন প্রসাদগুণ আছে। তা কুম্ভের গাইডবই তো নয়। এবার সমরেশদা ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র প্রতিনিধি আর আমি 'দেশ' পত্রিকার। সমরেশদা তখন হৃদরোগে

অনেকটাই কাবু, সঙ্গে স্ত্রী রয়েছেন তাঁর দেখভালের জন্য। কুম্ভের ভিড়ে তাঁর পক্ষে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানো সম্ভব ছিল না, পেরেও উঠতেন না, দু'তিনবার চেষ্টা করে রণে ভঙ্গ দিয়ে হোটেলে ফিরে আসতে হয়েছে। আমি সাধুদের আখড়ায় ঘোরাঘুরি করছি জেনে একদিন আমাকে ধরে পড়লেন, চলো তো, সাধুদের সঙ্গে নাকি তোমার খুব ভাব, আমাকে নিয়ে চলো। নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার এক নাগা সাধু বন্ধু ছিল, তাঁর সঙ্গে বসে গল্প-টল্প করলেন। সেইসব কথা লিখলেনও।

সেবারও কুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজন মারা যান। সংখ্যাটা কুড়ি-পঁচিশ তো হবেই। ঘটনাটা খুব ভোরবেলা ঘটেছিল, গঙ্গার একটি সেতুর ওপর। কুম্ভে-এবারও সাড়ে তিন কোটির ভিড় হয়েছিল। অর্থাৎ কুম্ভে ভিড়টাই এমন যে দুর্ঘটনা না ঘটাই অস্বাভাবিক। আমরা হরিদ্বারের কুম্ভে প্রায় কুড়ি দিন কাটিয়েছিলাম। বিভিন্ন স্নানের দিন এমন জনসমাগম ঘটত যে, বাজারের সংকীর্ণ রাস্তা ধরে হর-কি-পৌরিতে যেতে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। সেই ভিড়ে সমরেশ বসুর পক্ষে যাওয়া তখন একেবারেই অসম্ভব। হোটেলের দোতলার বারান্দা থেকে নাগাদের মিছিল বা জনতার স্রোত দেখা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। তবে যেদিন বড় যোগ না থাকত, সেদিন আমরা সবাই মিলে হর-কি-পৌরিতে যেতাম। সেখানেই একদিন দুপুরে এক গেরুয়াধারী সাধুর হাতে একটা বিটকেল আঁকাবাঁকা লাঠি দেখে সমরেশদা তাঁর দুর্বল হিন্দিতে জানতে চেয়েছিলেন, ইয়ে লাঠি আপকো কাঁহাসে মিলা? সাধুজি লাঠিটা তাঁর হাতে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আপনি সমরেশ বসু না?' দেখা গেল সাধু দিব্যি সাহিত্যজগতের খবর রাখেন। থাকেন হৃষীকেশের এক আশ্রমে।

স্নানেই পুণ্য হয় এমন কথা বাস্তবোচিত নয়। যে সৎকর্ম না করে, সদাচার যার নেই, যে সহজীবদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে না, যার ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রিত নয়, বাক-ব্যবহার-চিন্তা যার শুদ্ধ হয়নি সে কুম্ভের পুণ্যস্নানে কীই বা লাভ করতে পারে। বহিরঙ্গের স্নান সুতরাং প্রতীক মাত্র। আত্মশুদ্ধির জন্য বনে জঙ্গলে পাহাড়ে গিয়ে তপস্যারও প্রয়োজন নেই। যিনি নিয়ামক পুরুষ, তাঁর অধীনে নিত্য নিজেকে অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত করলেই ওই পুণ্যস্নান মানুষকে পবিত্রতা দান করতে পারে।

এক বিশাল মন্থন থেকেই জাত হয়েছিল অমৃত হরণের সেই দৈবী তঞ্চকতা। প্রত্যাশিত এবং ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত অসুরেরা বোধহয় আজও সেই সৌর শঠতাকে ভোলেনি। কুম্ভ কি তবু দৈবী মহিমার কথাই বলে? কে জানে। কিন্তু দেখতে পাই, কুম্ভ জুড়ে আজও চলেছে মানুষের মন্থন। দেশের আনাচ-কানাচ থেকে, বিদেশ থেকে, দূর-দূরান্ত থেকে কত রকমের মানুষের যে সমাগম, তা কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। মনে হবে যেন বিশাল কুম্ভে মুক্তি-সন্ধানী মানুষ কিসের এক অদৃশ্য আকর্ষণে বিঘুর্ণিত হয়ে চলেছে। সাধু-সন্ত, কল্পবাসী, কৌতূহলী পর্যটক, সাদা-কালো, ভালো-মন্দ সব একাকার হয়ে যাচ্ছে সেই ঘূর্ণনে। ইলাহাবাদ, হরিদ্বার উজ্জয়িনী, নাসিক সব একরকম। মন্থন চলেছে মানুষের অন্তরেও। পাপ, পুণ্য, জন্ম, মৃত্যু, বন্ধন, মুক্তির প্রকৃত অর্থ জানা নেই বলেই উদভ্রান্ত প্রশ্নাতুর মানুষ ছুটে আসছে কুম্ভে। সে কী পায়, কাকে পায় কে জানে। কিন্তু আসে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমা

বছর দশ-বারো আগে আমাকে যেতে হয়েছিল রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমায়। অযোধ্যা থেকে শুরু করে দুই পর্যায়ে আমি ধনুষ্কোটি পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

সাধারণ ভাবে ঘুরে বেড়াতে আমার যে খুব ভালো লাগে তা নয়। ঘুরে বেড়াবার নেশা যাকে বলে, তেমন কোনও নেশা আমার নেই। তবে বিভিন্ন কাজে আমাকে বহু জায়গাতেই যেতে হয়েছে এবং সেই যাওয়া যে খুব খারাপ লেগেছে এমনও নয়। বনবাসে বিসর্জিত হবার পর রামচন্দ্র যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছিলেন—চিহ্ন ধরে ধরে আবার সেই পথটিকে পুনরাবিষ্কার—এই কাজটির মধ্যে রোমাঞ্চ ছিল, কিছু অ্যাডভেঞ্চারও ছিল।

মুশকিল হল, রামচন্দ্র বলে সত্যিই কেউ ছিলেন কি না, তিনি সত্যিই বনবাসে গিয়েছিলেন কি না, কোন পথে গিয়েছিলেন, এ সমস্ত নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। বাস্তবে কী ঘটেছিল তা তো আমার জানা নেই। তবে এই পথ পরিক্রমায় বেরোনোর আগে আমাকে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করতে হয়েছিল।

যাত্রা শুরু করেছিলাম অযোধ্যা থেকে। এখন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে খারাপ লাগছে না, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল অযোধ্যাবাস খুব সুখের হবে না। একেই তো শহরটা ভীষণ ঘিঞ্জি। তার ওপর সেদিন রামনবমীর জন্য অসম্ভব ভিড়। আমি এক সাধুর আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলাম। হোটেল টোটেল ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থা অযোধ্যায় ছিল না, কাজেই সাধুর আশ্রমটি খুব ভালো না-হলেও চলে গিয়েছিল। অযোধ্যা থেকে শুরু করে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম—অর্থাৎ এলাহাবাদে, তারপর চিত্রকূট, মধ্যপ্রদেশের খানিকটা অঞ্চল—আমার প্রথম পর্যায়ের পরিক্রমা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আজকে পিছনে তাকিয়ে যখন ভাবি, মনে হয়, এই পরিক্রমের মধ্যে একটা অন্য মাত্রা যোগ হয়েছিল। নিছক ভ্রমণ তো এটা নয়, জায়গা দেখা নয়, একটা উদ্দেশ্যমূলক অনুসন্ধান। এবং সেটা করতে গিয়ে আমার মধ্যে অন্যরকম একটা কিছুর সঞ্চার হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমি প্রথম আবিষ্কার করি, হিন্দিবলয়ের একটা বিশাল অংশ রামচন্দ্রকে যে এত জানে, কথায় কথায় রামচন্দ্রের এত উল্লেখ করে, এর পিছনে একজন কবির মস্ত অবদান আছে। তিনি কবি হিসাবে কত বড় সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, তুলসীদাস একজন ভক্ত এবং কবি। রামচন্দ্রকে নয়, এই পরিভ্রমণে বেরিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম তুলসীদাসকে।

আমার আরেক মস্ত লাভ বিভিন্ন ধরনের মানুষের সান্নিধ্যলাভ। সাধারণ মানুষ সবাই। ছোট হোটেলওয়ালা, রিকশাওয়ালা, টাঙাওয়ালা, হোটেলের বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি, এরকম আরও বহু মানুষ, যাদের সঙ্গে আমাকে যেচে আলাপ করতে হয়েছিল আমার পরিক্রমা সংক্রান্ত তথ্যের প্রয়োজনে। আমার জীবনে এই সফরটাতে আমি পেয়েছি যাকে বলা যায় সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ। আমার নিজের ভেতরে যে কতকগুলো অজ্ঞানতা ছিল, সেই অজ্ঞানতাও কেটেছে এই অভিজ্ঞতার ফলে।

গুহক রাজার রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে গিয়েছিলেন রামচন্দ্র। কথা হল এই শৃঙ্গবেরপুরটা কোথায়। এলাহাবাদে আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও জানতে পারলাম না। কিন্তু ইউ পি ট্যুরিজমের একটি মেয়ে আমাকে শেষ পর্যন্ত একটা সন্ধান দিল। এটা এলাহবাদ থেকে ৪০-৫০ কিলোমিটার দূরে। বলল, কছৈড়ি থেকে বাস ছাড়ে। সেখান থেকে লালগোপালপুরের বাসে চলে যান। শৃঙ্গবেরপুর পথেই পড়বে। বাসরাস্তা থেকে হাঁটাপথ। টাঙাও পাবেন।

টাঙা অবশ্য ছিল না। দীর্ঘপথ রোদের মধ্যে হেঁটে পৌঁছলাম শৃঙ্গবেরপুরে। এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে ওখানে পৌঁছে প্রায় শুয়ে পড়ার মতো অবস্থা। উত্তরপ্রদেশের মানুষরা অতি সরল এবং অতিথিবৎসল। পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ফল-টল, পানীয় ইত্যাদি নিয়ে এল কয়েকটি ছেলে।

শৃঙ্গাবেরপুরে নদী আছে—গঙ্গা, কিন্তু এই শৃঙ্গবেরপুরেই রামচন্দ্র এসেছিলেন কি না তা আমি জানি না। নদী তার খাত বদল করে সরে আসতে পারে। ঘাট আছে। মন্দির আছে, ভালোই বসতি আছে। সেখানে একটা খননকার্য চলছিল। কুষাণ আমলের বা ওই সময়কার বহু নিদর্শন মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সেটা গুহক রাজার রাজধানী কি না সেটা তো বলার কোনও উপায় নেই। ওখানে রামচন্দ্রের খড়ম আছে, মন্দির আছে। শৃঙ্গবেরপুর একটা তীর্থক্ষেত্রেও হয়ে উঠেছে। ভালোই লাগবে, তবু একটা খটকা থেকেই যায় যে সেটাই আসল শৃঙ্গবেরপুর কি না।

অযোধ্যাও তাই। যে অযোধ্যাকে নিয়ে এত বিবাদ বিসম্বাদ সেই অযোধ্যাই যে আসল অযোধ্যা এ-কথা কে বলবে। একটা কিংবদন্তী আছে যে সম্রাট বিক্রমাদিত্য অযোধ্যাকে পুনরাবিষ্কার করেন। বিক্রমাদিত্য নাকি শিকারে গিয়েছিলেন, হঠাৎ দেখেন সরযূর ওপারে একজন কালো মানুষ কালো ঘোড়ায় চেপে নদীতে নামছে। নদীতে নেমে সে ডুবে গেল, এপারে যখন উঠল তখন সেও সাদা তার ঘোড়াও সাদা। তখন বিক্রমাদিত্য খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? সেই লোকটি উত্তর করল, আমি প্রয়াগরাজ। মানে, প্রয়াগের দেবতা। যত পাপীতাপী প্রয়াগের জলে স্নান করে, তাদের কলুষে আমি কালো হয়ে যাই। সেটা পরিষ্কার করার জন্যই আমি সরযূতে ডুব দিই। এরপর প্রয়াগরাজ বিক্রমাদিত্যকে বললেন, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, এটাই হচ্ছে পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা। তুমি এই নগরীকে পুনরুদ্ধার করবে। কপিলা গাই বা ওরকমই স্বর্গের কোনও গাভী যেখানে যেখানে দাঁড়াবে এবং তার বাঁট থেকে দুধ ঝরে পড়বে বুঝবে সেখানেই প্রাচীন অযোধ্যার কোনও না কোনও চিহ্ন রয়েছে। মজা হল, বিক্রমাদিত্য নিজেই এমন একটা চরিত্র যে মিথলজিতে তাকে যেমন ভাবে খুশি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই অর্থে রামচন্দ্রের বনবাসের পথটাও অনেকাংশেই মিথ। আমি সেই মিথকেই, মায়ামারীচকেই অনুসরণ করে গেছি।

তবে হ্যাঁ, চিত্রকূটে সেই পাহাড়টা তো আছে, যেখানে উনি বসবাস করতেন। চিত্রকূট থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল বিশাল দণ্ডকারণ্য। সে-সব গাছ সাফ হয়ে গেছে, অরণ্য নির্মূল হতে হতে ওড়িশার এক কোণে সামান্য কিছু জায়গায় টিকে আছে। চিত্রকূট থেকে অবশ্য আর কিছু প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না, আসলে চিত্রকূটে তেমন কোনও বসতি ছিলও না।

পঞ্চবটী, মানে নাসিকে, সীতাগুম্ফা রয়েছে। সেখান থেকেই নাকি সীতাহরণ হয়েছিল। সেগুলো যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে নাসিকের তীর্থক্ষেত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি রয়েছে, কারণ ওখানে কুম্ভমেলা হয়। কিন্তু জলের অভাব। শিপ্রা নদী একটা শুকনো নালার মতো বয়ে যাচ্ছে। একটা বেসিন করে রাখা আছে। লোকজন সেখানেই স্নান করে।

নাসিকে আরও একটা জিনিস দেখেছিলাম, ওরা বলে পাণ্ডব গুম্ফা। আসলে বৌদ্ধ শ্রমণদের গুহা। পাহাড়ের মাথায় প্রায় হাজার খানেক ফুট ওপরে। শ্রমণরা বেশ কষ্ট করেই থাকতেন সেখানে। জলের অভাব ছিল। বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পাথরের চৌবাচ্চা তৈরি করে রাখা হয়েছিল। বৌদ্ধরা চলে যাওয়ার পর এটাকে পাণ্ডবগুম্ফা নাম দিয়ে প্রচার করা হয় যে পাণ্ডবরা এখানে ছিলেন অজ্ঞাতবাসের সময়। এইরকম বহু

মিথ আমরা অল্প অনুসন্ধান করেই বাতিল করে দিতে পারি। কিন্তু এটা বোঝা যায় যে ওই মিথগুলোর একটা প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর প্রবলভাবে রয়েছে।

তুঙ্গভদ্রার তীরে যেখানে এখন তুঙ্গভদ্রা বাঁধ তৈরি হয়েছে, সেখানে ছিল বিজয়নগর-বাহমনি রাজ্য। ও জায়গাটা এমনিতেই ভ্রমণকারীদের কাছে খুব প্রিয়। বিজয়নগর-বাহমনি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ওখানে আছে। দুর্লভ পাথর দিয়ে তৈরি নানারকম কনস্ট্রাকশন সেখানে রয়েছে। অন্য একটা পাথর দিয়ে টোকা দিলে কোনওটা থেকে বাঁশির আওয়াজ হয়, কোনওটা থেকে মৃদঙ্গের আওয়াজ হয়। একটা আস্ত পাথর কেটে রথ তৈরি করা আছে। এখানেও মিথ আছে যে, সীতাহরণের সময় ওইখানেই রাবণের সঙ্গে জটায়ুর লড়াই হয়েছিল। ওখানকার লোকেরা পাথরের দুটো দাগ দেখায়—একটা সোনালি দাগ একটা রূপোলি দাগ। টানা চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। সে দুটো দাগ অবশ্য সত্যিই আছে। জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করলে রাবণ সীতাকে রথ থেকে নামিয়ে একটা গুহায় আটকে রেখেছিল। সীতাকে টেনে আনার সময় গয়নার ঘষায় ওই সোনালি দাগটা পড়ে। আর রুপোলি দাগটা পড়ে তাঁর শাড়ির ঘষায়।

এই জায়গাটাকে আমরা বলতে পারি কিষ্কিন্ধ্যা। সেখানেই রাবণের সঙ্গে জটায়ুর লড়াই হয়েছিল এবং এখান থেকেই রামচন্দ্র বানরসেনা সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে রামচন্দ্রের পথের কোনও দিকনির্দেশ পাওয়া দুরূহ। আর কোনও তীর্থক্ষেত্র পাওয়া যাবে না, যেখানে রামচন্দ্র বসবাস করেছিলেন বলে মিথ চালু আছে।

ধনুষ্কোটি—এখনকার রামেশ্বরমের কাছে। এখান থেকেই রামচন্দ্র সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। এখানে রামচন্দ্রের বসবাসের কিছু নিদর্শন দেখানো হয়। ধনুষ্কোটি পর্যন্ত আগে ট্রেন যেত। আমরা সে অবধি যেতে পারিনি। কারণ ঝড়ে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রামেশ্বরম পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

উত্তর ভারতে রামচন্দ্রের যে প্রভাব, দক্ষিণ ভারতে তা কিন্তু নেই। এই পরিক্রমায় আমি বেরিয়েছিলাম সম্পূর্ণ একা। নিজের মালপত্র নিজেকেই বইতে হত। খাওয়ার কষ্টও ছিল বেশ কিছু জায়গায়। তবুও এটা আমার কাছে বেশ মনোরম স্মৃতি হয়ে আছে।

এ যেন শৈশবে উজিয়ে যাওয়া

আর একবার শৈশবের দিকে কিছুদিন উজিয়ে যাওয়া গেল। না, সবটাই শৈশবের চেনা জায়গা নয়। কিছু নতুন কিছু পুরনো। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগকে ধন্যবাদ। এই পরিভ্রমণের আয়োজনটি করেছিলেন তাঁরাই। নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে প্রথমে মিরিক। তারপর মানেভঞ্জন এবং ধোতরে হয়ে দার্জিলিং। টাইগার হিল থেকে কালিংপং ফের চড়াই। এবার লাভা। সমতলে নেমে এসে মালবাজার ছুঁয়ে জলদাপাড়া অরণ্য। তারপর মেটেলি এবং সামসিং। অতঃপর প্রত্যাবর্তন। মার্চের ২ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত এই রূপবর্ণগন্ধময় ঘটনাবহুল পরিভ্রমণটি অভিজ্ঞতায় নতুন কিছু স্বাদ সঞ্চার করল।

পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, বিহারের উত্তরাঞ্চল এবং আসামে শৈশব কেটেছে বলে পাহাড় আমার অনেকদিনের সঙ্গী। আর ওই দার্জিলিং, মালবাজার, মাদারিহাট, মেটেলি সামসিং টাইগার হিল বা কালিংপং শৈশবের মায়াঞ্জন মাখা চোখ দিয়ে দেখেছিলাম, বলে আজও এইসব জায়গা বড় টানে। মালবাজারে আমরা যখন ছিলাম তখন সন্ধের পর ফেউ ডাকাত, বাড়ির পাশেই ফুটবলের মাঠে চিতাবাঘের বাচ্চারা খেলা করেছে। কী নির্জন, কী নিঃশব্দ ছিল। বহুকাল পর গিয়ে আর সেই শৈশবের জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেল না ঠিকই, কিন্তু হারানো কিছু দিন আবার ফিরে এল। ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যার বিস্তৃতি আসমুদ্র-হিমাচল। তবু পর্যটক আকর্ষণ করার মতো সংখ্যাধিক স্থান এ রাজ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দীঘা বা বকখালির সমুদ্র, সুন্দরবন বা জলদাপাড়ার অরণ্য, কিছু পুরাকীর্তি আমাদের সম্বল। তবে দর্শনযোগ্য স্থানের অভাব অনেকটাই পূরণ করে দিয়েছে উত্তরের হিমালয়। একা দার্জিলিং শতাধিক বছর ধরে যে বিপুল পর্যটক আকর্ষণ করেছে তা খুব কম শৈলশহরের ভাগ্যেই জোটে। হিমালয়ের এই গুরুত্ব অনুধাবন করেই রাজ্যের পর্যটন বিভাগ এই অঞ্চলে পর্যটন উন্নয়নে বিপুল উদ্যোগ দিয়েছেন। তার ফলেই, মিরিক, লাভা ইত্যাদি নতুন নতুন শৈলাবাস সৃষ্টি হয়েছে। তৈরি হয়েছে চমৎকার ট্রেকিং পয়েন্ট সানদাক ফু। আগে টাইগার হিল-এ থাকবার ব্যবস্থা ছিল না, দার্জিলিং বা ঘুম থেকে যেতে হত। এখন সেখানেও তৈরি হয়েছে টুরিস্ট লজ। অলস লোক ঘরে বসেই বিখ্যাত সুর্যোদয় দেখে নিতে পারেন। টাইগার হিল-এর প্রায় সমান উচ্চতায় তৈরি হয়েছে ছোট্ট ও সুন্দর শৈলবাস লাভা। ঘুম থেকে কালিম্পং যাওয়ার পথে পড়ে। লাভা টাইগার হিল-এর মতো শীতল নয়, তবে সুন্দর। পার্বত্য অঞ্চলে এরকম আরও কিছু জায়গা বেছে নেওয়া হচ্ছে অচিরেই যেগুলি পর্যটকদের পদধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে। রুক্ষ প্রকৃতির এইসব পাহাড়ী অঞ্চলে কিছু কৃষি, কয়েকটা চা-বাগান, সামান্য কিছু কুটির শিল্প ছাড়া আর্থিক দিকটা বড়ই শূন্য। পর্যটনই এইসব অঞ্চলের সবচেয়ে জোরালো অর্থনীতি।

সত্তরের দশকে তৎকালীন রাজ্যপাল ডায়াস মিরিকে আসেন একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে। থরবু চা-বাগান কর্তৃপক্ষের অধিকারভূক্ত এই মিরিক তখন সামান্য এক জনপদ। একটি বেশ বড়সড় জলাভূমি ছিল তখন। ডায়াস জায়গাটি দেখে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কে এখানে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে

তোলার অনুরোধ করেন। সিদ্ধার্থশংকর অনুরোধটা ফেলেননি। সেই থেকে মিরিক জন্ম নেয়। জলাভূমি এখন রূপান্তরিত হয়েছে বিশাল হ্রদে।

সেখানে কাচতন্তুর নৌকায় বিহারের ব্যবস্থা। প্রচুর মাছ ছাড়া হয়েছে জলে। হেসে খেলে তারা বড় হচ্ছে। সেই চমৎকার হ্রদের দিকে মুখ করে পাহাড়ের গায়ে সরকারী টুরিস্ট লজ। ডরমিটরি, কুটির মিলিয়ে বহুজনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা। অচিরেই বেসরকারি হোটেল, দোকানপাট, ঝকঝকে বাজারে গমগম করে উঠবে মিরিক। তার বিস্তৃত আয়োজন দেখা গেল চারদিকে। দার্জিলিং-এর সঙ্গে পাল্লা টানতে না পারলেও মিরিকের নিজস্ব আকর্ষণ বড় কম নয়। মার্চের শীতেও সেখানে প্রচুর মানুষের সমাগম দেখা গেল। তবে দিনকে এসে দিনকে ফিরে যাওয়া পর্যটকই বেশি। দার্জিলিঙের ভার এবং ভিড় দুই-ই কিঞ্চিৎ লাঘব করতে শুরু করেছে মিরিক। আছে একটি আদ্যন্ত রোমান্টিক পাইনের রহস্য ও ছায়াঘন অরণ্য। ছোটখাটো ট্রেকিং করার মতো জায়গা আছে। হ্রদের ওপর একটি সুদৃশ্য সেতু এবং হ্রদের জলে কাচতন্তুর একটি অতিকায় পদ্মফুল যেটি আসলে ফোয়ারা। হ্রদের জলে পাইন অরণ্যের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় হ্রদটিকে ঘিরে একটি চমৎকার পথ আছে। পরিক্রমার এই পথটি স্বাস্থ্য ও মন দুইয়ের পক্ষেই খুব উপকারী। শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিঙের সঙ্গে মিরিকের সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা চমৎকার। মিরিকের প্রতি পর্যটন বিভাগের একটু পক্ষপাত আছে, আছে মিরিক নিয়ে একটু গর্বও। কারণ এই শৈলাবাসটির বীজ থেকে প্রস্ফুটন অবধি সব দায়দায়িত্বই তাঁদের ছিল। বাজীটা তাঁরা জিতেছেন। থরবু চা-বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নেওয়া এই শহরের জমি এবং প্লট তাঁরাই বিতরণ করছেন। তাঁদেরই প্রত্যক্ষ খবরদারিতে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে চমৎকার এক শহর। দলে আমরা মোট চারজন।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, আলোকময় ঘোষ এবং দেশ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে আমি। রাজ্য পর্যটন বিভাগের ডেভেলপমেন্ট অফিসার সুধেন্দু ভট্টাচার্য ছিলেন আমাদের এই পরিক্রমার অতি দায়িত্বশীল ও প্রশ্রয় পরায়ণ অভিভাবক। আর সারথি ছিলেন ক্ষেত্রী, যাঁকে দেখতে অবিকল রাজেশ খান্নার মতো। একসময়ে ইনি বিধান রায়ের গাড়ি চালাতেন। ইন্দিরা গান্ধী, নেহরু, ম্যাকনামারা থেকে শুরু করে দেশ ও বিদেশের বহু ভি আই পি-রই সারথি হয়েছেন তিনি। বয়স হয়েছে, কিন্তু মেদহীন ছিপছিপে চেহারার গৌরবর্ণ এই মানুষটিকে কখনোই আঠাশ বছরের বেশি বয়সী বলে মনে হয়নি আমাদের। পাঁচজনে মিলে একটি চমৎকার টিম তৈরি হয়ে গিয়েছিল শিলিগুড়ি থেকে প্রথম দিন মিরিক রওনা হওয়ার পরেই। পথ আমাদের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল। শেষ দিনটায় ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে।

মিরিকে লানচ। মেঘ, কুয়াশা, শীত। হ্রদের চার পাঁচশো ফুট ওপরে, পাইন বনের মুখোমুখি টুরিস্ট লজের বিশাল কাচে মোড়া ডাইনিং হল-এ বসে খাদ্যে এবং দৃশ্যে আমরা মুগ্ধ। যেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই আছে সস্তার ডরমিটারি এবং ডবল বেডরুম। আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল আলাদা কটেজে। কিছুটা পাকদণ্ডী বেয়ে নামতে হয়। ছোটো ছোটো বস্তি, দাবার ছকের মতো ছোটো ছোটো সব ক্ষেতে সর্ষে, টমেটো, বেগুনের চাষ, শুয়োরের খোঁয়ার পাশ কাটিয়ে নামতে হয়। হিটার গীজার সমেত কটেজের ব্যবস্থা রীতিমতো ভালো। বিকেলে হ্রদের জলে নৌকোবিহারের সময় শিবরাম চক্রবর্তীর একনিষ্ঠ ভক্ত চিরঞ্জীবের দারুণ দারুণ পানিং-এর চোটে আমরা দিশেহারা।

পাইন বন এবং পান মিলে বিকেলটা চমৎকার জমে গেল জলে। পরদিন সকালে মিরিকের রূপ আরো মুগ্ধকর লাগল। কিন্তু কপাল খারাপ। মেঘ কাটল না, কুয়াশায় ঘিরে রইল চারদিক। মিরিক-দার্জিলিং সড়কের মাঝ বরাবর সুখিয়াপোখরি একটি গঞ্জ। সেখান থেকে মনভঞ্জন এবং ধোতরে নামক দুটি জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি ছিল একটি জিপ। মানেভঞ্জন এবং ধোতরের কঠিন চড়াই উৎড়াই ভাঙবার পক্ষে অ্যামবাসাডারে উপযুক্ত বাহন নয়। তবে দৃশ্যাবলী মনোমুগ্ধকর।

মানেভঞ্জন ছোট একটু গঞ্জ, এখানে একটি টুরিস্ট হোটেল তৈরি হচ্ছে। এখান থেকেই সানডাক-ফু'র ট্রেকিং শুরু হয়। গগনমার্গী সেই পথটি দেখেই একটু ভয়-ভয় করে। ওই পথে নয়, ধোতরে থেকে আর

একটু শর্টকাট করে আগামী মে মাসে আমাদেরও যেতে হবে সানডাক ফু, জীপের রাস্তা আছে বটে, কিন্তু ভুক্তভোগীরা বলেন, ওই সংকীর্ণ রাস্তায় যখন জীপ ঊর্ধ্বগামী হয় এবং পৃথিবী অতলে তলিয়ে যেতে থাকে তখন অন্য দুর্ঘটনা না ঘটুক ভয়ে হৃদরোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। সুতরাং ওই ভয়ংকর পথটি পায়ে হেঁটে যাওয়াই বরং বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে। প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু সানডাক ফু নাকি হিমালয়ের কোলে এক অত্যাশ্চর্য জায়গা। সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং এভারেস্টকে হাতের নাগালে বলে প্রতিভাত হয়। মনেভঞ্জন থেকে আরও একটু ভিতরে ধোতরে, নেপাল-ভারতের সীমান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে এঁকেবেঁকে পথ গেছে। সেখানেও তৈরি হচ্ছে টুরিস্ট হস্টেল। বহু লোকের জায়গা হতে পারবে। তবে আরাম বা স্বাচ্ছন্দের অভাব ঘটাতেই পারে। কারণ এখানে যাঁরা আসবেন তাঁরা ট্রেকিং করতেই আসবেন, প্রমোদভ্রমণে নয়। এখানকার ফরেস্ট অফিসার শ্রী লেপচা সর্বদাই হাসিখুশি এবং দারুণ রুগুড়ে। তাঁর চোখেমুখে সর্বদাই নানা রসরসিকতা মিটমিট করছে। আমাদের চিরঞ্জীব এবং আলোকের সঙ্গে তাঁর দারুণ জমে গেল। সামান্য ক্ষণের পরিচয় এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে যেতে পারেন যে-মানুষ বসুধায় তাঁর অকুটুম্ব বোধ করি কেউ নেই। লেপচার তদারকিতেই গড়ে উঠেছে। পান্থনিবাসটি।

ফেরার সময় সুখিয়াপোখরি পার হয়ে পাহাড়ি পথে আমাদের জিপ একটু গোলমাল করেছিল একবার। জিপ সারিয়ে কুয়াশায় আচ্ছন্ন পথে আবার রওনা হয়ে বেশ ভয়-ভয় করতে লাগল। কিছু দেখা যাচ্ছে না। অথচ সুব্বা গাড়ি চালাচ্ছে দুর্দান্ত বেগে। পার হচ্ছে অজস্র আচমকা বাঁক। মানুষ কমপিউটারপ্রতিম না হলে ওরকম সম্ভব হত না। দার্জিলিং ঢুকবার মুখে উলটোদিক থেকে আসা আর একটা জিপ আমাদের জিপকে ছোট্ট একটা গুঁতো দিয়েছিল। গুঁতোটা আর একটু জোরে হলে এবং রাস্তার আর একটু ধারে হলে শ'তিনেক ফুট নিচু থেকে আমাদের ভাঙাচোরা দেহ তুলে আনতে হত। এই দুটি ঘটনার পর আমাদের ভ্রমণবিলাসী এলানো ভাবটা কেটে গেল। আমরা বেশ টান টান হয়ে বসলাম। অন্তত আমি। আশৈশব পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় বড় হয়েও আজ আমি চারতলার ছাদ থেকে নিচের দিকে চাইতে পারি না, গা শিরশির করে, খাদের ধারে দাঁড়ালে তো কথাই নেই। তাই সংকীর্ণ গিরিপথের ওই টক্করটা আমাকে যৎপরোনাস্তি নাড়া দিয়েছিল।

দার্জিলিং-এর কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। শেষবার এই শহরে এসেছিলাম বোধহয় ষাটের দশকে। একবার ঘুম থেকে মাঝরাতে হেঁটে টাইগার হিল-এ উঠেছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। দার্জিলিং-এ কম করেও ত্রিশ চল্লিশবার এসেছি। এবার এলাম দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। কিন্তু পাহাড় বড় একটা পাল্টায় না। পাহাড়ি শহরেরও পরিবর্তন তেমন চোখে পড়ার মতো নয়। কিছু বাড়ি-ঘর আর দোকানপাট বেড়েছে। বেড়েছে লোকও। ভয়ও সেইখানেই। দার্জিলিং-এ অত্যধিক জনসমাগম যে সুখকর বা স্বাস্থ্যপ্রদ হবে না সেটা ইংরেজরা ভালোভাবেই বুঝেছিল। এ শহরটা তাই তৈরি হয়েছিল হাজার কুড়ি লোকের বাসোপোযোগী করে। হিলকার্ট রোড বা ন্যারোগেজের ট্রেনও খুব বেশি ভারবাহী নয়। ব্রিটিশ আমলে যা ছিল তার চেয়ে হিলকার্ট রোডকে আর একটু চওড়া করা হয়েছে বটে, কিন্তু যে পথে আগে ছোট্ট হাফটন ট্রাকের চেয়ে বড় ট্রাকের প্রবেশাধিকার ছিল না সে পথে এখন অবিরল ভারী ভারী গাড়ি চলছে। সেই নিরবচ্ছিন্ন কম্পন ও চাপে প্রতিবছর ধস নামছে বিভিন্ন জায়গায়। বাড়ছে দুর্ঘটনা। সুধেন্দুবাবু নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আমাকে এসব বোঝাচ্ছিলেন। দার্জিলিং-এ যাওয়ার পথটির বাস্তবিকই আমূল সংস্কার দরকার। প্রয়োজন শহরের জনবসতির বিকেন্দ্রীকরণও। ম্যাল-এ এখন মেলার ভিড়। পথঘাট রীতিমত ভিড়াক্রান্ত। তাও এটা সিজন নয়। সিজনে তাহলে কী অবস্থা হয় আজকাল? দার্জিলিং-এ একরাত্রির বিরামের পর আমরা রওনা হলাম টাইগার হিল। চূড়া থেকে মাত্র দু-কিলোমিটার আগে তৈরি করা হয়েছে একটি টুরিস্ট লজ। রাত্রিবেলা গাড়ি থেকে নামতেই উত্তরমেরুর আবহাওয়ার আঁচ পাওয়া গেল। সম্ভবত অনেকেই এই আশ্রয়স্থলটির খোঁজ রাখেন না বা রাখলেও এখানে এসে থাকার উৎসাহ পান না। তবে ম্যানেজার তামাং সাহেব বললেন, আসে সাহেবরা। সারা বছর তারাই দখল করে থাকে ঘর। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই। এখন অবশ্য একজন সাহেব ছাড়া আর কেউই নেই। সেই সাহেব নিউজিল্যান্ডের তরুণ কচি স্টিভ জেফরে। তার

সঙ্গে আলাপ জমে উঠতে মোটেই দেরি হল না। সেই ফাঁকে সে শুনিয়ে দিল তাঁর পাঁচ-পাঁচটি কবিতা। তার চেয়েও বড় কথা স্টিভ ঈশ্বর ভূত এবং উফো মানে। উফো বা আকাশে রহস্যময় উড়ন্ত চাকীর ঝাঁক সে নাকি স্বচক্ষে দেখছে। তার গার্ল ফ্রেন্ড যোগ শিখছে পণ্ডিচেরীতে। স্টিভ চষে বেড়াচ্ছে সারা ভারতবর্ষ। সে ভালো হোটেলে থাকে না, কথায় কথায় ট্যাকসি চড়ে না। বেশ গরিবের মতো ঘুরছে। তামাং সাহেব ভূত পোষেন, সাপ পোষেন। স্টিভ আর তামাং-এ বেশ ভাবসাব হয়ে গেছে। স্টিভ কেন এত দেশ থাকতে ভারতবর্ষে তার কষ্টে জমানো পয়সা খরচ করতে এল? একটুও না ভেবে সে জবাব দিল, কাঞ্চনজঙ্ঘার জন্য। শুধুমাত্র কাঞ্চনজঙ্ঘার জন্য।

একটি পাহাড়ের প্রেম যে এত প্রগাঢ় হতে পারে তা জানা ছিল না। সারাদিন স্টিভ কবিতা লেখে বিষয় বিচিত্র। যোগিনী, ফ্রেন্ডশীপ, পোয়েট্রি এই সব। তেমন উঁচু মানের কবিতা না হলেও স্টিভের মানসিকতায় ভারতীয়ত্বের অনুপ্রবেশ গভীরভাবেই ঘটে গেছে।

পরদিন সকালে শীতের তীব্রতা কিছু কম ছিল। মেঘ আর কুয়াশার চারদিক সমাচ্ছন্ন, তারই মধ্যে আমরা টাইগার হিলের চূড়োয় উঠে দেখি, সেখানে রাসমেলার ভিড়। এমনকী অনেকে এসেছেন শীতবস্ত্র ছাড়াই। এইসব গরম মানুষকে দেখে ভারী হিংসে হল। কিন্তু যা দেখতে আসা সেই বিশ্রুত সূর্যোদয় বা আকাশের ময়ূরকণ্ঠী বর্ণালী দেখা হল না। কুয়াশার আবছায়া থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা মলিনভাবে একটু দেখা গেল মাত্র। এভারেস্ট চোখের আড়ালে রয়ে গেল। মার্চে এরকম আবহাওয়া থাকবার কথা নয়। কপাল ঘুম হয়ে কালিম্পং-এ রওনা হওয়ার পথেও সেই কুয়াশা আর মেঘ ঘিরে রইল আমাদের অনেক দূর অবধি। লপচু চা-বাগানের কাছ বরাবর পৌঁছে আবার রোদ্দুরের দেখা পাওয়া গেল। পথটি চমৎকার। পর্যটকদের আনাগোনা কম। তিস্তা উপত্যকায় নামবার একটু আগে একটি পাহাড়চূড়ায় লাভারস মীট নামে রোমান্টিক একটি অবজারভেটারি আছে। শাল ও শিশু গাছের ছায়া ও নির্জনতায় সেখানে দাঁড়ালে কয়েক হাজার ফুট খাড়া নিচে দেখা যায় তিস্তা ও রঙ্গিতের সঙ্গমস্থল। রঙ্গিতের সবুজাভ স্রোত মিলিত হয়েছে তিস্তার রূপোলি ধরায়। উজ্জ্বল দুই পাহাড়ি নদীর মিলনদৃশ্য লাভারস মীট থেকে পটে আঁকা ছবি যেন।

উত্তরবঙ্গে যে জায়গাটি পর্যটকদের দ্বারা সবচেয়ে উপেক্ষিত এবং যে জায়গাটি আমার মতো আরও কিছু মানুষের খুব প্রিয় তার নাম কালিম্পং। এই পাহাড়ি শহরটির সর্বাঙ্গে বাঙালিয়ানার ছাপ আছে, আর আছে দুর্লভ নির্জনতা। পরিচ্ছন্ন এই শহরটির নাম রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। আমার দেখা এই একমাত্র শৈলশহর যেখানে ধানক্ষেত, বাঁশগাছ, কলার ঝাড় এবং পাইনবন একাকার হয়ে গেছে। আমরা যে চমৎকার সরকারি ট্যুরিস্ট লজে উঠলাম তার ম্যানেজার অমিতাভ দত্ত মনাস্টারি যাওয়ার পথে একটি অসাধারণ জায়গায় নিয়ে গেলেন। খাড়া পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে নিচে তাকালে তিস্তার স্রোত এবং অতিকায় এক উপত্যকা চোখে পড়ে। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে টিকটিকির মতো নামতে পারলে (রোজ অসংখ্য পাহাড়ি ছেলে-মেয়ে এই পথে নিচে নেমে কাঠ সংগ্রহ করে আনে) মা কালীর জিবের মতো একটা চ্যাটালো পাথরের ওপর দাঁড়ানো যায় ওই পাথরটার আমরা নামকরণ করলাম, সুইসাইড পয়েন্ট। সুধেন্দুবাবু এই জায়গাটিকে পর্যটক আকর্ষণ করার যোগ্য করে তুলবেন বলে আমাদের কথা দিলেন।

মেঘ ও রোদ্দুরের খেলা চলছেই। দিগন্ত পর্যন্ত কখনোই দৃষ্টি প্রসারিত হয় না। তবু কালিম্পং আমাকে ভিন্ন এক গভীর ও গোপন দৃশ্য দেখাচ্ছিল, বাল্যকালে একবার বাবার সঙ্গে এসেছিলাম এখানে। ফরাসি এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী ট্রেনে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং আসছিলেন। পথে তাঁর সব মালপত্র চুরি যায়। তিনি রেলের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে রেল সাধারণত ক্ষতিপূরণ দেয় না। কিন্তু সন্ন্যাসিনী এবং বিদেশিনী বলেই বোধহয় তাঁর দাবি রেল, মেনে নেয়। রেলের প্রতিনিধি হিসেবে বাবা এসেছিলেন ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁর হাতে তুলে দিতে। কালিম্পং তখন আরও জনবিরল, আরও নিস্তব্ধ। ফরাসি সেই সন্ন্যাসিনী চেক হাতে পেয়ে যে আনন্দের হাসি হেসেছিলেন তা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান। সেই সরল উজ্জ্বল হাসিটি যেন কালিম্পংকে আরও সুন্দর করে তুলেছিল। সেইবার রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চিত্রভানুতে গিয়ে

প্রতিমা দেবীকে দেখি। এমন সার্থকনামা মহিলা জীবনে খুব বেশি দেখিনি। সস্নেহে বলেছিলেন, দেখ, তোমার ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখ।

কালিম্পং থেকে লাভা আবার চড়াই। রাস্তা চওড়া, মসৃণ। লাভার উচ্চতা টাইগার হিল-এর সমান। শহর হিসেবে এখনো মর্যাদা পায়নি। তবে বেশ বড়সড় গঞ্জ। বনবিভাগের একটি সুদৃশ্য ও আরামদায়ক লজ আছে। অচিরেই পর্যটন বিভাগ এখানে গড়ে তুলবেন তাঁদের অতিথিনিবাস। দার্জিলিং-এর ভিড় কমাতে লাভা যে খুব সহায়ক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিকমতো গড়ে উঠলে এটি হবে দ্বিতীয় দার্জিলিং। লাভার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরিসীম। নিবিড় গাছপালায় ছাওয়া এই জনপদটিতে ইতিমধ্যে কিছু কিছু ভ্রমণবিলাসীর আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।

জলদাপাড়া অরণ্যকে অরণ্য বলা যাবে কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। কদিন আগেই মধ্যপ্রদেশে বান্ধবগড় অরণ্যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এখানে তা হওয়ার উপায় নেই। রাজপথের পাশে এবং সামরিক ছাউনির গা ঘেঁষে অবস্থিত বলে এই অরণ্যের আরণ্যক চরিত্রের অনেকটাই হানি ঘটেছে। মাঝে মাঝে বিস্তৃত অঞ্চল বৃক্ষহীন পড়ে আছে। তবে বৃক্ষের অভাব পূরণ করেছে সতেজ নিবিড় ও দীর্ঘ ঘাসের বন। এমনই ঘন যে আমরা হাতি সমেত তার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এরকম ঘাসবন আর কখনো দেখিনি। বিশ ত্রিশ বছর আগেও ডুয়ারস ও তরাই জুড়ে যে নিবিড় জঙ্গল ছিল ইতিমধ্যে তা নির্মম কুঠারের ঘায়ে পিছিয়ে গেছে অনেক। নতুন গাছপালা লাগানোর কর্মসূচী তেমন গুরুত্বের সঙ্গে রূপায়িত হয়নি বলে উত্তরবঙ্গের আরণ্যক চরিত্র ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। বাঘ বা অন্য জন্তু-জানোয়ারের জন্য ততটা নয়, যতটা জলদাপাড়ার খ্যাতি গণ্ডারের জন্য। আর আছে আশেপাশের জঙ্গলে বুনো হাতি। হাতিদের অত্যাচারের কথা প্রায়ই খবরের কাগজে বেরোয়। এই বিপুল শরীরী বুদ্ধিমান প্রাণীটি সুরসিকও বটে। জলদাপাড়ার বুনো হাতিরা এখনও পোষা হাতি বা হস্তিনীর সঙ্গে প্রেম-প্রণয় করে যায়। পোষা হাতি বা বুনোদের টানে ঘর ছেড়ে কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়। উত্তরবঙ্গের হাতিরা যেমন সুরসিক তেমনি সুরাসিকও বটে। শ্রমিক বস্তিতে হানা দিয়ে তারা প্রায়ই হাঁড়িয়া ডাকাতি করে খেয়ে যায়। মাত্র কয়েকদিন আগে একটি বুনো হাতি জলদাপাড়ার ফরেস্ট অফিসে হানা দিয়ে এক মাহুতের বউকে মেরে ফেলেছিল। সেই হাতিটা পাগল না সুস্থ তা স্থির করা যায়নি। তাই অরণ্যে ঢোকার আগে আমাদের বারবার হাতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। কিন্তু হাতির ভয় আমার ছিল না। আমার ছিল শৈশবে দেখা উত্তরবঙ্গের জন্য গভীর বেদনাবোধ। এখন বাঘ বা নেহাত বাঘের পায়ের ছাপটুকু দেখতে কত পরিশ্রম করতে হয়। সে আমলে বিন্নাগুড়ি টি এস্টেটে আমার এক মামি সন্ধের পর রান্নঘরে রান্না করছেন, পোষা কুকুরটা দরজায় বসে, এমন সময় বাঘ এসে চোখের পলকে কুকুরটাকে নিয়ে গেল। ভোর রাত্রিতে জলদাপাড়ার ফরেস্ট লজ থেকে হাতিতে সওয়ার হলাম। তারপর সাড়ে চার ঘণ্টার একটানা অরণ্যচারণ। একজোড়া গণ্ডার অত্যন্ত নির্ভয়ে দেখা দিল এবং প্রায় পোষা গণ্ডারের মতোই পর্যটকদের ক্যামেরার জন্য নানারকম পোজ দিয়ে গেল আধ ঘণ্টা ধরে। জলদাপাড়ায় ময়ূর অসংখ্য। নীলগাই, সম্বর আছে, তবে মুষ্টিমেয়। বাঘ মাত্র ছ'টা। বুনো শুয়োর আছে। ঘুরতে-ঘুরতেই কানে এল সামরিক বাহিনীর চাঁদমারির শব্দ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। জলদাপাড়াকে আর একটু গভীর ও বৃহৎ অরণ্যে পরিণত করা বড় প্রয়োজন। চাই শুধু আর একটু উদ্যোগ।

স্মরণ

আমার বন্ধু সৌমিত্র

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তা ভাবিনি কখনও। কিছুদিন আগেই দেখা হয়েছিল। কাজ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, জিগ্যেস করলাম, এখন দিনে কত ঘণ্টা কাজ করো? জবাবে বলল, এখন বেশি চাপ নিই না ভাই, দিনে চার ঘণ্টা শুটিং করতে পারি, তার বেশি নয়।

অভিনয় একটা শারীরিক পরিশ্রমের কাজও বটে, কারণ তাতে আউটডোর আছে, মেক আপ আছে, রিহার্সাল আছে, রিটেক আছে, ডাবিং আছে। পঁচাশি বছর বয়সেও সৌমিত্র অবশ্য সক্রিয় ও সজীব ছিল। বিজ্ঞাপনের কাজও বিস্তর করছিল। এই সক্রিয়তার দরুনই হয়তো শরীর ও মনে ভালোই ছিল, আবার কে জানে এত কাজের সূত্রেই কোভিড সংক্রমণ হল কি না। এটা না-হলে সৌমিত্রকে আমরা আরও কিছুদিন পেতাম।

ষাট বছরেরও বেশি হবে, আমি তখন লজ্জাজনক বেতনে কলকাতার নিম্নমানের একটা স্কুলের মাস্টার, আর সৌমিত্র তখন উঠতি নায়ক। শুধু নায়কই নয়, বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের ছবির নায়ক। তবু সেই সময়েই সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠিত দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে কফিহাউসের সূত্রে আমার একটু বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সৌমিত্র সকালের দিকে ঘণ্টা দেড়েক-দুয়েকের জন্য কফিহাউসে আসত, তার তখনকার প্রিয় বন্ধু নির্মাল্য আচার্যর সঙ্গে আড্ডা দিতে, আমরাও থাকতাম তখন। নির্মাল্য আর সৌমিত্রের সম্পাদনায় তখন এক্ষণ পত্রিকা বেরোচ্ছে। আমি মুখচোরা, আনস্মার্ট বলে বেশি কথাবার্তা বলতাম না, তবে চুপ করে শুনতাম আর অনুধাবন করতাম। সৌমিত্রর সেন্স অফ হিউমার ছিল তীক্ষ্ন, কণ্ঠস্বর দারুণ ভালো, উচ্চারণ, লাজবাব। আর চেহারার কথা তো বলারই নয়।

আমি তার অভিনয় নিয়ে তেমন কিছু বলিনি, অভিনয়ে তার প্রায় স্বভাবগত দক্ষতা, কাজেই বলাটা বাহুল্যমাত্র। শিশির ভাদুড়ীর কাছে তালিম নিয়েছে, আকাশবাণীতে ঘোষকের কাজ করছে, অতি দক্ষ আবৃত্তিকার। সব দিক দিয়েই তৈরি মানুষ।

বাঙালি সুদর্শন নায়কদের মধ্যে লালিত্য ও কমনীয়তা বেশি মাচো বা কর্কশ পৌরুষ কিছু কম। উত্তমকুমারকে ধরেই বলছি। মেদবর্জিত কেঠো সৌন্দর্য বাঙালি নায়কদের নেই, সেটা তাদের খামতি বলে গণ্য করা যায় না, সেটা এ দেশের জলবাতাসেরই প্রভাব। তৎকালে বলিউডের নায়কদেরও কেউ হলিউডের মাচো নায়কদের মতো নয়। রাজ কাপুর, দিলীপকুমার বা দেব আনন্দ, সবাই একইরকম লালিত্যবহুল চেহারার। সত্যজিৎ যখন 'অভিযান' ছবি করলেন, তখন রাফ অ্যান্ড টাফ নায়ক হিসেবে সৌমিত্রকেই বেছে নিলেন। এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সৌমিত্রের পক্ষে। আশ্চর্যের বিষয় মেক আপ আর অভিনয়ের জোরে সৌমিত্র যা অভিনয় করল তা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার চেহারা বা চরিত্রে যে ওই উগ্র কঠোর

চরিত্রের ছায়াও নেই সেটা সে বুঝতেই দেয়নি। কফিহাউসে আমি তাকে কথাটা বলায় ভীষণ খুশি হয়ে কফি খাইয়ে দিল। চরিত্রটি নিয়ে যে সে নিজেও টেনশনে ছিল তাও স্বীকার করল।

কফিহাউসের আড্ডা থেকে আমাকে বিদায় নিতে হয়েছিল কাজ এবং সংসারের দায়িত্ব চলে আসায়। সেই থেকে সৌমিত্রের সঙ্গে দেখাশুনো হত না। তার এবং আমার কাজের ক্ষেত্রও তো আলাদা। দীর্ঘকাল যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে আবার নানা অনুষ্ঠানে দেখা হতে লাগল, আমার কাহিনি নিয়ে তৈরি বেশ কয়েকটা ছবিতে অভিনয়ও করেছে সে। 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'-র প্রমোশনমূলক একটি লাইভ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে কিছুদিন আগে সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। কত কথাই যে হল। আমার ছেলেমেয়ে আর বউমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল। সেদিন অন্য একটি অনুষ্ঠানে যেতে হবে বলে আমি বেরিয়ে যাওয়ার পরও সে বেশ কিছু সময় আমার পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছিল।

বছর দেড়েক আগে আমি আর সৌমিত্র এক অনুষ্ঠানে একইসঙ্গে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। ঢাকায় একই হোটেলে ছিলাম আমরা। তখনও ভালোই আড্ডা হয়েছিল দুদিন। একটি চ্যানেল থেকে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিল।

ইদানীং মাঝে মাঝে বলত, বুঝলে, শেষটা দেখতে পাচ্ছি তো তাই একটু ভাবনা হয়। নিজেকে নিয়ে আত্মকথনের ভঙ্গিতে তার করা একটা নাটক দেখতে গিয়েছিলাম পৌলমীর আমন্ত্রণে সৌমিত্রের আশিতম জন্মদিনেই বোধহয়। নাটকের শেষে তার হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়ার কথা আমার। তখনই সর্বসমক্ষে বললাম, এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কথা ভাবছ কেন তুমি? হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় বাকি।

সৌমিত্র চলেই গেল। একটু ফাঁকা লাগছে। একটু বিষাদ ছেয়ে আছে মন।

সৌমিত্র

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকবছর আগে কফিহাউসে। আমি তখন সবে মাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছি আর সৌমিত্রর অভিনয় জীবন সবে শুরু হয়েছে। তখন কফিহাউসের দিকে প্রায় বসে আড্ডা মারতাম, মূলত সকালের দিকেই। তখন সৌমিত্র আর নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' কাগজে আমি টুকটাক লিখতাম। কাজেই সবমিলিয়ে একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের বলয়টা আলাদা, ও অভিনয় জগতের মানুষ আর আমি লেখালেখি জগতের। তাই নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ খুব একটা হত না।

তার পর আমারও কাজের চাপ বাড়ায় কফিহাউসে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়, তখন দেখাসাক্ষাৎ আরও কমে গিয়েছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমার গল্প থেকে নির্মিত ছবিতে সৌমিত্র অভিনয় করেছে। তখন আবার নতুন করে দেখাসাক্ষাৎ-কথাবার্তা শুরু হল। তবে আমাদের মধ্যে বরাবরই একটা পারিবারিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ও আমার ছেলেমেয়েকে খুব স্নেহ করত, আমিও করতাম। মানুষ সৌমিত্র আমাদের বড়ই আপন ছিল। আর অভিনেতা সৌমিত্র সম্পর্কে নতুন করে আর কী বলি!

সে তাঁর অভিনয় জীবনে কত রকমের চরিত্র যে করেছে, আর এত সুন্দর ভাবে করেছে তা আর নতুন করে বলার নেই। তবে শুধুই অভিনয় জগতে নয়, বাস্তবেও সৌমিত্র একজন ভার্সেটাইল মানুষ। সে একাধারে কবি, আবৃত্তিকার সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার আরও কত কী! অনেকরকম গুণ ওঁর মধ্যে ছিল আর মানুষ হিসেবেও চমৎকার। আর কী প্রাণশক্তি! কাজ করতে ভীষণ ভালোবাসত। এই ৮৫ বছর বয়সেও অদম্য উৎসাহে কাজ করে গিয়েছে। আসলে ও অভিনয়টাকে খুব ভালোবাসত। আমি একবার জিগ্যেস করেছিলাম—'তোমার জীবনের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কি?'

সে বলেছিল—'অভিনয়। অভিনয়ের জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।'

আরও একটা অসাধারণ গুণ ছিল সৌমিত্রর, আবৃত্তি করা। কী চমৎকার আবৃত্তি করত। একবার আমরা দিল্লি গিয়েছিলাম একটা অনুষ্ঠানে। সেখানে কয়েকটা আবৃত্তি করেছিল। মনে হয়েছিল, ওঁর কণ্ঠে কবিতাগুলো যেন অন্য মাত্রা পেল! সেবার আমাকে বারবার বলেছিল নাটক লিখতে, সে অভিনয় করবে। কিছুদিন আগেই অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের ছবি 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'-র প্রমোশনে আমাদের বাড়ি এসেছিল। সেদিন অনেক কথা হয়েছিল, অনেক স্মৃতিচারণা। এমনকী আমি বেরিয়ে আসার পরেও সৌমিত্র আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছিল।

একবার ওঁর জন্মদিনে ওঁর জীবনের ওপর একটা নাটক করেছিল। আমি আমন্ত্রিত ছিলাম। তবে নাটকের কিছু দৃশ্য দেখে খুব মন খারাপ হয়েছিল। স্টেজে উঠে বলেওছিলাম—'এরকম নাটক তুমি আর কোরো না। আমার মন খারাপ হয়ে যায়। তোমাকে এখনও অনেকদিন থাকতে হবে আমাদের মধ্যে।'

সব মিলিয়ে সৌমিত্র একজন বর্ণময় মানুষ ছিলেন। ওঁর ব্যক্তিগত জীবনে নানান দুঃখ থাকা সত্ত্বেও এতবছর বয়স পর্যন্ত ও যেভাবে কাজ করে গেছে সেটাই শেখার। এরকম একজন সফল মানুষ বাংলা তথা ভারত তথা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন! আপামর বাঙালির কাছে এটা খুবই কষ্টের। আর আমি তো আমার বন্ধুকে হারালাম, তাই কষ্টটা আরও বেশি।

সুনীল, কৃত্তিবাস ও আমি

সুনীলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়কালে আর সেই সূত্রেই পরিচয় কৃত্তিবাস পত্রিকার সঙ্গে; তবে সেটা নেহাত পাঠক হিসেবে, কেননা আমি তো কবিতা লিখতে পারি না। তবে আমি লিখেছিলাম। ওরা একবার কমল মজুমদার সংখ্যা করেছিল। কমল মজুমদারের আমি খুব ভক্ত ছিলাম। তাই একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম ওঁকে নিয়ে; ওটাই আমার কৃত্তিবাসে প্রথম লেখা, পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসে উপন্যাসও লিখেছি। সুনীল সেবার একটা মজার কথা বলেছিল, যারা উপন্যাস লিখবে তাদের বউদের সোনার গয়না দেওয়া হবে।

কৃত্তিবাসের প্রসঙ্গ তুললামই যখন, দুজনের কথা বলতেই হয়, পিনাকী ঠাকুর আর দিব্যেন্দু পালিত। দেশ পত্রিকায় চাকরি যাওয়ার পর পিনাকী কৃত্তিবাসে চাকরি করত। খুব দারিদ্র্যের মধ্যেই ছিল, কিন্তু অসম্ভব ভালো কবিতা লিখত আর অসম্ভব ভালো মানুষ, অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্র, ওরকম মানুষ আজকাল দেখাই যায় না। আর দিব্যেন্দু দেখত মূলত বিজ্ঞাপনের দিকটা আর লিখতও খুব ভালো। ওদের দুজনের অকস্মাৎ মৃত্যুটা আমাকে ভীষণ ব্যথিত করেছে।

তবে কৃত্তিবাসের প্রাণপুরুষ ছিল সুনীল, যদিও পরবর্তীকালে ওঁর ব্যস্ততার জন্য আর টাকার অভাবে কৃত্তিবাস বার বার অনিয়মিত হয়ে গেছে। সুনীলের কিছু বন্ধু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করত, কিন্তু শুধু এভাবে তো কাগজ বেরোয় না, দরকার বিজ্ঞাপনের, সেটা না পেলে কাগজ চলে না। কিন্তু এত অচলাবস্থা সত্ত্বেও কৃত্তিবাসের প্রতি কবিদের ভালোবাসা ছিল অগাধ, কেননা কৃত্তিবাসই একমাত্র কবিদের একটা বিরাট মিলনক্ষেত্র হয়ে গিয়েছিল। কৃত্তিবাসের দপ্তরও অনেকবার বদলেছে; বর্তমানে দপ্তর গড়িয়াহাটে, ধনঞ্জয় দেখাশোনা করে এখন। তবে বড় দুঃখের কথা কৃত্তিবাস এখন অভিভাবকহীন; যদিও নতুন প্রজন্মের অংশুমান, শ্রীজাত, সম্রাজ্ঞী, অভিজিৎ চালিয়ে যাচ্ছে কৃত্তিবাসকে। বাংলায় কবিতা পত্রিকার ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের তো একটা বড় অবদান আছেই, তাই আমি সবসময় চাই কৃত্তিবাস চলুক। আর সুনীলও তো কোনওদিন চায়নি কৃত্তিবাস বন্ধ হোক। তরুণ কবিদের প্রতি ওর ভীষণ দুর্বলতা ও সমর্থন ছিল; আর এই কৃত্তিবাস হল তরুণ কবিদের মুখপত্র। সুনীল পারলে সকলের কবিতাই ছেপে দিত। ওর এই বাৎসল্যের ফলে কিছু কিছু কাঁচা কবিতাও বেরিয়ে যেত। শক্তি আবার অকবিতা সহ্য করতে পারত না। মাঝে-মাঝেই বলত, 'এসব কী হচ্ছে সুনীল? কাদের কবিতা ছাপছ?'

একটা মজার ঘটনা বলি, একদিন সাগরময় ঘোষ আমাকে ডেকে বললেন, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। সুনীল আর শক্তিকে মুখোমুখি বসিয়ে একটা বিতর্কের ব্যবস্থা করো। বেশ বড় করে লিখবে।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'দুই বন্ধুর ঝগড়া লাগাতে হবে সাগরদা? সেটা কি আমি পারব?'

'ওটা তোমাকেই করতে হবে।'

অগত্যা। শক্তি, সুনীল, দুজনেই রাজি হয়ে গেল। শর্ত ছিল একটাই, ভালো স্কচ খাওয়াতে হবে। সাগরদাকে বলতেই সেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। সুনীলের দশতলার ফ্ল্যাটে আমরা তিনজন এক সন্ধ্যাবেলায় বসলাম, বিতর্ক শুরু থেকেই জমজমাট। শক্তির মধ্যে একটা কবিতা-পাগল সত্ত্বা ছিল, ফলে সে খারাপ কবিতা একদম সহ্য করতে পারত না। তবে সুনীল শক্তিকে বারবার সাবধান করছিল, 'শক্তি, শীর্ষেন্দু তোমার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে।' সেই সাক্ষাৎকারে সুনীল খানিকটা রক্ষণাত্মক ছিল, কারণ শক্তির অভিযোগ ছিল তার ওই স্নেহপ্রবণ প্রশ্রয়দাতার ভূমিকার বিরুদ্ধে। দেশ পত্রিকার প্রচ্ছদকাহিনি হিসেবে আমাদের কার্টুনসহ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

পঁচিশ বছরেরও বেশি 'দেশ' পত্রিকার দফতরে আমরা পাশাপাশি বসতাম, সুনীল ছিল অ্যাসোসিয়েট এডিটর আর আমি ছিলাম অ্যাসিস্টেন্ট এডিটর। অফিসে সবাই খুব সমীহ করত ওকে, একমাত্র আমি ওকে 'মোটুক' বলে খ্যাপাতাম। সুনীল শুনে মৃদু মৃদু হাসত।

কাজকর্মের তেমন চাপ ছিল না, আড্ডাই হত বেশি, আমাদের আড্ডা খুব বিখ্যাত ছিল। প্রায়ই আমি তাকে প্রশ্ন করতাম। 'সুনীল লেখেন কখন?'

সুনীল খুব হাসত আর বলত, 'আপনার মতো আমি রাত জেগে লিখি না, আমি লিখি সকালে। তাও দু-আড়াই ঘণ্টা মাত্র।'

কিন্তু আমার বিস্ময় যায় না। কী না লিখত সুনীল! কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার আরও কত কী!। তার ওপর তার আগ্রাসী বই পড়ার স্বভাব। এ সবের জন্য যে সময়টা দরকার, সেটা সুনীল কিভাবে বের করত ও-ই জানে।

শুধু আড্ডাই নয়, অনেক লোকও আসত ওর সঙ্গে দেখা করতে। সুনীলের বন্ধু-বাৎসল্য ছিল কিংবন্তির মতো। বন্ধুদের আবদার ফেলতে পারত না বলে নিজের জরুরি কাজ ফেলে তাদের সঙ্গ দিয়েছে, তাদের লেখা ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, যখন ইচ্ছে নেই তখনও সুরাপান করেছে তাদের সঙ্গে বসে। প্রায় প্রতিরাতেই কোনও না কোনও বন্ধুর বাড়িতে পানভোজের নেমন্তন্ন থাকত, ফলে শুতে রাত হত। কিন্তু বিপুল যে ভালোবাসা বন্ধুদের কাছে অর্জন করেছিল, তার দায় না মিটিয়ে পারত না সে। সকালে, বিকেলে, রাতে, দেশে, বিদেশে, সর্বত্রই সবসময়ে গিজগিজ করছে তার বন্ধু। বন্ধুদের জন্য দুয়ার অবারিত করে নিজের গার্হস্থ্যকেই যেন বৃহত্তর গণ্ডিতে নিয়ে ফেলেছিল সুনীল। বাইরে থেকে কত লোক এসে যে সুনীলের ফ্ল্যাটে আশ্রয় পেয়েছে, তার গোনাগুনতি নেই। এত মানুষ আসে আর থাকে বলে কখনও সুনীল বা তার লক্ষ্মীমন্ত বউ স্বাতীকে অপ্রসন্ন হতে দেখিনি। আটাত্তরের বন্যায় একবার সুনীলের গাড়িতে বাড়ি ফেরার সময় আমরা টিভোলি কোর্টের কাছে ফেঁসে গেলাম। বুকজল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে গড়িয়াহাট পৌঁছলে সুনীল বলল, 'শীর্ষেন্দু, আপনার আজ আর যাদবপুরে যাওয়ার দরকার নেই, আমার বাড়িতে চলুন।' রাজি হয়ে গেলাম। সেই রাতে ওরা স্বামী-স্ত্রী আর ধনঞ্জয় মিলে আমার স্বপাক খাওয়ার সুচারু বন্দোবস্ত করে দিল। আমার শুদ্ধাচারের প্রতি ভীষণ সতর্ক ছিল সুনীল আর স্বাতী।

'যুবক-যুবতীরা' বা 'আত্মপ্রকাশ'-এর মতো উপন্যাস সুনীল লিখেছিল বত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে। দুটো উপন্যাসেই ওর নিজের আর বন্ধুদের লাগামছাড়া জীবনযাপনের কথা উঠে এসেছে। ওঁর লেখনী আর কাহিনি বিন্যাস আমার খুব ভালো লাগত। আমার ব্যক্তিগতভাবে সবথেকে প্রিয় উপন্যাস 'সেই সময়' আর ছোটদের লেখার মধ্যে 'সবুজ দ্বীপের রাজা।'

সুনীল আর আমার মধ্যে কখনও তর্ক হত না, সুনীল তর্ক করতে ভালোবাসত না। আমাকে প্রায় বলত, 'আমি ভাবছি এবার থেকে নিরামিষ খাব। সিগারেট ছেড়ে দেব আর ড্রিঙ্ক করব না।' কিন্তু পেরে উঠত কই! বন্ধুরা মধুর জবরদস্তিতে ঠিক ধরিয়ে দিত। অফুরান প্রাণশক্তি ছিল বলে শরীরের তোয়াক্কা সুনীল কোনওদিন করেনি। মাঝে মাঝে নামমাত্র প্রাতঃভ্রমণ ছাড়া কোনও ব্যায়াম ছিল না তার। খাদ্য-পানীয়র ওপর ছিল না নিয়ন্ত্রণ। সুনীল ছিল অকুতোভয়, কিন্তু আমি ভয় পেতাম। মনে পড়ে, সুনীলের ৭৫তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে

গিয়ে মঞ্চে আমার পাশে বসা সুনীলের চেহারাটা দেখে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন বক্তৃতায় সুনীলকে লক্ষ্য করেই বলেছিলাম, সুনীল, আপনাকে কিন্তু অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। আর বেঁচে থাকার জন্য যা যা করতে হয়, সবই আমাদের মুখ চেয়ে আপনি কিন্তু করবেন।' সুনীল ম্লান হেসেছিল তারপর হাতটা বাড়িয়ে ধরেছিল আমার হাত।

সেই হাতের স্পর্শটি আমার আজও হাতে লেগে আছে। সুনীল এখন আমাদের নাগালের অনেক বাইরে এক অচিনপুরের যাত্রী। সুনীলের এবছর পঁচাশি বছর হল, সম্প্রতি ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের নাম পাল্টেও তো কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সরণী' হয়েছে, আমি এই সিদ্ধান্তে ভীষণ খুশি। সুনীল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে ঠিকই, তবুও এভাবেই রয়ে গেছে আমাদের স্মৃতিতে, মননে, ধ্যানে, পাঠে আর কৃত্তিবাসে। তাই না থেকেও সুনীল থেকে যাবে আজীবন।

মৃত্যু ও মায়ের কষ্ট

এই একজন মানুষ থাকে এক কথায় বলা যায় চমৎকার। গড়পড়তা আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা যায় না। তার কারণ তার আচার আচরণের সহজ স্বাভাবিকতা, সব কিছুতেই প্রখর মাত্রাজ্ঞান, বুদ্ধিমিশ্রিত সারল্য, সকলের প্রতি মনোযোগ ও তুচ্ছকেও গুরুত্ব প্রদানের কয়েকটি দুর্লভ লক্ষণ রয়েছে। এই মানুষটি যখন যেটা মনে হয় সেটাই করে। কিন্তু করে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। দীর্ঘদিন এই মোটাসোটা আহ্লাদী ধরনের চেহারার মানুষটিকে আমি লক্ষ্য করে আসছি। কায়াটি সামান্য স্থুল বটে, কিন্তু ভিতরের মানুষটি সম্পূর্ণ অন্যরকম।

১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ বোধ হয় আমাদের পরিচয় হয়েছিল। সুনীল তখন কৃত্তিবাস বের করে, তৎকালীন তুর্কী তরুণ কবি সাহিত্যিককে নিয়ে বেশ একটা গণ্ডগোলের বন্ধুগোষ্ঠী পাকিয়ে তুলেছিল। সুনীলই মধ্যমণি ছিল এমন বলছি না। আসলে মধ্যমণি ছিল কে নয়? শক্তি, সন্দীপন, শ্যামল, তারাপদ, শঙ্কর সবাই। আমরা কয়েকজন সেই বৃত্তের ভিতরে না হলেও পরিধির ধার ঘেঁষেই ছিলাম। বলা বাহুল্য সেইসব আড্ডার ধ্রুব স্থানটি ছিল কলেজ স্ট্রিটের প্রথাসিদ্ধ কফি হাউস বা ইউনিভার্সিটির আনাচ-কানাচ এবং অন্যত্রও। সব জায়গার খবর আমার জানা নেই।

আর একটু বুড়ো হওয়ার পর সুনীল বা সমকালীন বঙ্গসমাজকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করা যাবে। কিন্তু ১৯৬১ সালে জামশেদপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কথা না বললেই নয়। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মাথায় ভূতই চেপে থাকবে। সেবার তারা গাদাগুচ্ছের অনামী কবি-সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেলেন। নামকরা বলতে আমাদের পালের গোদা একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আর সবই ডিম ফুটে বেরোচ্ছে বা বেরিয়েছে। অ্যালেন গিনসবার্গ আর পিটার ওরলভস্কি সেই দলে জুটে গিয়েছিল। দুঃখের বিষয় আমরা কেউই তেমন কথাবার্তা বলতে পটু নই। বক্তৃতা দিতে উঠলে হাঁটুতে হাঁটুতে করকত্তাল বাজে। সেই সুযোগে স্বর্গতা পূরবী মুখার্জি আমাদের তুলোধোনা করলেন। তাঁর দোষও ছিল না। কেউ কেউ তাঁকে উসকেও দিয়েছিল। যাই হোক সকলের মুখ রক্ষা অবশেষে করেছিল সুনীল। আজও যে সুনীল খুব ভালো বক্তা তা নয়। কিন্তু সেদিন সেই ১৯৬১ সালের এক সন্ধেবেলা সে বলেছিল ভারী অদ্ভুত। চালাকি নেই, কপটতা নেই, সাজানো-গোজানো কৃত্রিমতা নেই, স্পর্ধা নেই। কী লিখতে চায় তরুণেরা, কেন লিখতে চায় তারই একটি হৃদয়স্পর্শী আন্তরিক সত্যভাষণ। অনেকের চোখে জল এসেছিল।

সেদিনের সেই ভাষণটির ভিতর দিয়ে সুনীলের ভিতরকার চেহারাটা যেমন ফুটেছিল তেমনি আজও তার কোনও কোনও লেখায় ভিতরকার অকপটতা প্রকাশ পায়।

লোকে ভাববে এ হল পরস্পরের পিঠ চুলকোনো। কিন্তু আদৌ তা নয়। সুনীল এবং আমি পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নই। এমনকী আমাদের গোষ্ঠীগত দায় দায়িত্বও নেই। আমাদের গোষ্ঠীও (যদি কিছু থেকে থাকে) আলাদা। আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী বটে, কিন্তু সেজন্য তাকে খামোখা ওপরে তোলার কোনও প্রয়োজন নেই।

কবি সুনীল স্ব-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বটে, গোষ্ঠীপ্রধানও তাকে বলা যায়। কিন্তু তাকে তার গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠতম কবি না বললেও অপরাধ হয় না। তার পাশাপাশি শক্তি, উৎপল, বিনয়, সমানে পাল্লা দিয়েছে। এই গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ কবি কে তা আজও নিরূপিত হয়নি বোধ হয়। অনেকে শক্তিকে দেখিয়ে দেয়। হবে বোধ হয়। আমার কাছে সকলেই প্রিয়, আলাদা আলাদা রকমে।

'মৃত্যু ও মায়ের কষ্ট পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটে যায়' এই পঙক্তির মধ্যে আবার সেই সত্যসন্ধ মানুষটিকে আবিষ্কার করা গিয়েছিল। মাতৃভক্তির নৈতিক ও সামাজিক মূল্য সম্পর্কে সুনীল সচেতন কিনা জানি না। কিন্তু এই পঙক্তি যে লেখে সে মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে।

যতদূর মনে পড়ে, সুনীলের যে গদ্যটি আমি প্রথমে পড়ি তার নাম 'রানী ও অবিনাশ' খুব নাড়াচাড়া খাওয়ার মতো লেখা। কিন্তু রানীর সবটুকু রহস্য উন্মোচনের জন্য অবিনাশ যে কেন তার দেহভোগের বায়না ধরেছিল তা আজও আমার কাছে রহস্য। দেহভোগ দিয়ে সবটুকু মেয়েটাকে জানা যাবে এ সুনীলের কেমনতর ফিলজফি বাপু? তা তবু নতুন চোখা চালাক কথা আর বেশ হায়ালজ্জাহীন প্রসঙ্গ আমাদের টেনেছিল খুব।

আমার পড়া সুনীলের পরের গদ্যটি মারাত্মক। 'সোনালী দুঃখ' যারা পড়েননি লেখাটা পেলে পড়ে নেবেন। একটি বিদেশি লোককথাকে অবলম্বন করে এত সুন্দর লেখা যায় তা না পড়লে বিশ্বাস হবে না।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করে ফিরে এসে সুনীল তার প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশ করে। আমরা বাধিত হলাম 'যুবক যুবতীরা' উপহার পেয়ে। পরবর্তী উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' যথার্থই তার আত্মপ্রকাশকে সূচীত করেছিল। এই দুই উপন্যাসে আমাদের সমকালীন এবং অতি পরিচিত কবি-সাহিত্যিকদের কয়েকজনকে বেশ স্পষ্ট চেনা যায়।

তারপর থেকে সুনীল আর পেছু ফিরে তাকায়নি। সর-সর করে এগিয়ে গিয়ে বাংলা কথাশিল্পের প্রথম সারির লেখকদের পাশাপাশি নিজের জায়গাটি করে নিয়েছে। অথচ সে নিজেই কবুল করে, গদ্য লেখে লিখতে হয় বলেই। গদ্যে যে যথেষ্ট মনোযোগী নয়, কবিতাই তার প্রকৃত অবলম্বন।

কথাটাকে আজ আর গুরুত্ব না দিলেও চলে। কবি সুনীলকে যে চেনে তার শতগুণ চেনে কথাশিল্পী সুনীলকে। গদ্যে সুতরাং তাকে মনোযোগী হতেই হয়েছে এতদিনে। মনোযোগী না হলে কি 'খরা'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প লেখা যায়?

সুনীলের ছোট গল্পের তুলনায় উপন্যাসের সংখ্যা বোধ হয় বেশি। কিন্তু সে যদি আরও ছোট গল্প লিখত তাহলে আমরা আরও লাভবান হতাম নিশ্চিত। ছোটগল্পে তার একটা আলাদা মুন্সিয়ানা আছে যা 'গরম ভাত' বা 'দেবদূত' অথবা 'বারোহাটের কানাকাড়ি' গল্পে জ্বলজ্বল করে ওঠে। তার পরিণত মানসিকতার এই দুটি সৃষ্টি আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে চিরকাল থেকে যাবে।

আমাদের অকাল-প্রয়াত বন্ধু শংকর চট্টোপাধ্যায় সুনীলের বিয়ের পর একবার জনান্তিকে আমাকে বলেছিল, সুনীলের কপালটা দেখলেন? যে মেয়েটার সঙ্গে ভাব করে বিয়ে হল সে মেয়েটাও কপালজোরে বামুন! ওর হবে না তো কার হবে?

সুনীলের কপাল সম্পর্কে আমার তেমন কিছু জানা নেই। তবে যেটুকু জানি তা হল সে অসম্ভব পরিশ্রমী। চেহারাটা আহ্লাদী হলেও নিজেকে সে খুব একটা আহ্লাদে রাখে না। পায়ের তলায় চাকা বাঁধাই আছে। হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াতে দেখি। এই বয়সে তার উপন্যাসের সংখ্যা যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাও বিস্ময়কর। বিনা শ্রমে তা তো লেখা হয়ে ওঠেনি। অনুমান করি, বিরলে সে নিশ্চিত কুলির মতোই খাটে।

অতীব বন্ধুৎবৎসল, উদার, খানিকটা বিষয়-বিরাগী সুনীল মানুষ হিসেবে যেমন চমৎকার, লেখক-হিসেবেও তেমনি ধারালো।

ধনে পুত্রে যশে প্রতিষ্ঠায় তার লক্ষ্মী-সরস্বতী লাভ হোক।

সুনীল

কোনো কবি-সাহিত্যিককে নিয়ে এমন হইচই হয়েছে বলে আমার জানা নেই, যা হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। এই দু'জন সম্পর্কে এমন কিছুই আমার জ্ঞাত নয় যা জনসাধারণ জানেন না। এই হইচই ঘটবার হয়তো দরকার ছিল। পঞ্চাশের দশকে গণদরবারে সাহিত্য যে ম্রিয়মানতায় ভুত তা গা-ঝাড়া দিয়ে কাটিয়ে উঠেছে এই দুই অতি সফল যুগপৎ কবি ও গদ্যকারের কল্যাণে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্প্রতি বঙ্কিম পুরস্কার দেওয়ায় কিছু বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে, কেউ কেউ খুশি হয়নি। কিন্তু আমার তো মনে হয় গত দুই যুগ ধরে সুনীল গদ্যে পদ্যে যা লিখেছে তাতে পুরস্কার তার অবশ্যই পাওনা হয়।

কবি-স্বভাবের মধ্যে সুনীলের যে সুতীব্র বেদনাবোধ ও রহস্যময়তা আছে তা আমাকে বরাবর তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে। তার কিছু কবিতা আছে যা ভালো-মন্দ বিচারের ঊর্ধ্বে। জীবনানন্দের প্রভাবে আচ্ছন্ন পরবর্তী কবিতা প্রজন্মেও সুনীল অতি স্বতন্ত্র, অতি আধুনিক। সবচেয়ে বড় কথা তার কবিতার বই বেরোলে লোকে কাড়াকাড়ি করে কেনে, যেমন কেনে শক্তির। অর্থাৎ সুনীল ও শক্তি বাঙালি পাঠককে আধুনিক কবিতার মেজাজে মেজাজি করে তুলতে পেরেছে। কবিতামনস্কতা জন্ম নিয়েছে তার ফলে এবং অগুন্তি তরুণ কবি অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাদের দ্বারা। এই সফলতা এক যুদ্ধ জয়ের মতোই।

খুব সম্প্রতি সুনীলের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থটি হাতে পেয়ে পড়তে শুরু করি এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যাই। অনেক কবিতাই আগে পড়া, তবু আবার পড়েও দারুণ লাগছিল। শুধু শব্দের খেলা তো নয়, কবিতার পিছনে যে মনটি ক্রিয়াশীল তা পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে কত সচেতন, মানুষ সম্পর্কে কত আগ্রহী। গভীর অনুসন্ধিৎসায় কত প্রগাঢ় তার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে।

মানুষ হিসেবেও সুনীল অত্যাধিক সৎ, অনুদ্ধত, প্রাণবান এবং স্নেহশীল। এই গুণাবলীর সমন্বয় একটি মানুষের মধ্যে আজকাল কদাচিৎ দেখা যায়। লেখার জন্য নয়, লেখা ছাপানোর জন্যও নয়, সুনীলের ব্যক্তিগত আকর্ষণও প্রতিদিন তার কাছে বহু লোককে টেনে আনে। আশ্চর্য নয় যে এই সব মানুষের মধ্যে বহু ললনাও থাকেন। জনপ্রিয়তার খেসারত তাকে বড় কম দিতে হয় না। আবার এ কথাও বলে রাখা ভালো, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি অর্থ, প্রেম কোনো কিছু অর্জনের জন্যই তার কোন সচেতন প্রয়াস নেই। বিগত দুই দশক ধরে দেখে তার সম্পর্কে আমার এই অভিজ্ঞতা।

গদ্যকার সুনীল সম্পর্কে দু-চারটি কথা। খুব কম লেখকই নিজস্ব স্টাইল, নিজস্ব গদ্যভঙ্গি তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। কাজটা সহজও তো নয়। অতীতের সমস্ত উত্তরাধিকারকে স্বীকার করেও তার প্রভাবমুক্ত থেকে নিজস্বতা তৈরি যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগীই জানেন। সুনীল তা অনায়াসে পেরেছে। তার উপন্যাস,

ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, আলোচনা ও ছোটগল্প এক সুস্নিগ্ধ, বোধযোগ্য, তীক্ষ্নধার গদ্যে সমৃদ্ধ। বেশি লেখে বলে তার বিরুদ্ধে অনেকের ক্ষোভ আছে। কিন্তু বেশি লিখেও তো সে ফুরিয়ে যাচ্ছে না, পেছিয়ে পড়ছে না।

ধনেপুত্রেও সে লক্ষ্মীলাভ করেছে। ভাগ্য নয় নিরলস উদ্যম, ধৈর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা, জীবনযাপনের প্রতি তীব্র ভালোবাসাই তাকে জয় এনে দিয়েছে। বৃহত্তর জয় এল বলে।

এই আমাদের বাদল

বাদলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল নিতান্তই ছোকরা বয়সে! তখনও আমি কোনও উপন্যাস লিখিনি বা আনন্দ পাবলিশার্স থেকে আমার বইও বেরোয়নি। সাহিত্যিক বিমল কর তখন তরুণ লেখকদের সঙ্গে সন্ধেবেলা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ভিতরে একটি চায়ের দোকানে আড্ডা দিতেন। সেখানেও বাদলও আসত। রং কালো হলেও ছিপছিপে, টান টান চেহারার বাদল ছিল খুবই সুপুরুষ। কিন্তু সেই যৌবনকালেও তার সাজগোজ বিশেষ ছিল না। ধুতি আর সাদা শার্ট ছিল তার মার্কামারা পোশাক। অনেক পরে বিদেশে যাওয়ার সময় সে প্যান্ট-শার্ট পরত বটে, কিন্তু আর কখনও ধুতি-শার্ট ছাড়া অন্য পোশাক পরত না। তখন বাদলের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, আনন্দ পাবলিশার্সে চাকরি করে।

বাদলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে বিশেষ দেরি হয়নি। তবে বাদল ছিল কাজের মানুষ। আমরা যেমন কফি হাউসে বা বিমলদার আড্ডায় দেদার আড্ডা দিতাম, বাদলের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কাজের ব্যাপারে সে ছিল অতি নিয়মনিষ্ঠ, কোনও ফাঁকিবাজি বা আলসেমি ছিল না, আর প্রকাশনার যে বিচিত্র কাজ তা সে পছন্দও করত। কাজের প্রতি তার এই আনুগত্য এবং ভালোবাসা এমনই পর্যায়ের ছিল, যার জন্য সে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও দিত মেপে, কখনও কাজকে অবহেলা করে নয়। আমি থাকতাম মহাত্মা গাঁধী রোড আর রামমোহন রায় রোডের সংযোগস্থলের কাছেই, আর বাদলের কর্মস্থল ছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পাশেই একটা গলির ভিতরে গৌরাঙ্গ প্রেসে। দুরত্ব সামান্যই। অথচ আমার ঘরে কখনও বাদল এসেছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আমার সেই ভাগের ঘরে বিমল কর, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গাঙ্গুলি, দেবদুলাল, জটিলেশ্বর থেকে কে আসেনি আড্ডা দিতে। সিরাজ তো অনেক রাত অবধি গল্প করত। তারপর অনেক রাতে বাস না পেয়ে হেঁটে এন্টালির বাসায় ফিরে যেত।

আমি কখনও-সখনও গৌরাঙ্গ প্রেসে গিয়েছি। তেমন কোনও কাজে নয়। আড্ডা দিতেই! সেখানে বড্ড ছোট জায়গায় বাদলকে বসতে হত। গেলে চা খাওয়াত, গল্পও করত। তার তখন অনেক বড় বড় লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ, মেলামেশা। ফণিভূষণ দেব তখন আনন্দ-র কর্তাব্যক্তি বটে, কিন্তু বাদলের ওপরেই ছিল দায়িত্ব, সে দম ফেলার সময় পেত না। যখন-তখন লেখকদের বাড়ি ছুটতে হত প্রুফ দিতে বা প্রুফ আনতে। যত দূর মনে পড়ে তখন বাদলের একটা স্কুটার ছিল। তাইতেই সর্বত্র গমনাগমন। বেশ কিছুদিন পরে সে অফিস থেকে একটা গাড়ি পেয়েছিল।

তখন বাদল কী পোস্টে চাকরি করত তা আমি জানি না। কত বেতন পেত, সচ্ছলতা ছিল কি না, তার বাড়ির কী খবর এসব আমার জানাই ছিল না। বাড়ি বা হাঁড়ির খবর নেওয়ার মতো মানসিকতাও তখন নয়। এমনকী, সে বিবাহিত কি না তা-ও জানতাম না। তবে এটুকু জানতাম সে প্রেম-ট্রেমের ধার ধারে না।

আনন্দ কোন বই ছাপবে বা না ছাপবে তা নির্বাচন করার দায়িত্ব বাদলের ছিল না। তবু তরুণ ও তরুণী কবি-সাহিত্যিকরা ধরে নিয়েছিল প্রকাশযোগ্য বই নির্বাচনে বাদলের হাত আছে। এইজন্য তাকে বিস্তর তোষামোদ সইতে হয়েছে। তরুণী কবি লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও করতে চেয়েছে। কিন্তু বাদল ছিল চাঁচাছোলা মানুষ, ভাবের ঘুঘুও নয়, রোমান্টিক ডালপালাও তার ছিল না, কাউকেই সে ল্যাজে খেলায়নি, পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছে। সেইসব গল্প যখন বলত তখন আমি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে বলতাম, দূর মশাই আপনি বড্ড অ্যান্টি-রোমান্টিক। বাদল হ্যা হ্যা করে হাসত।

ঝাড়গ্রামের দহিজুড়ি গ্রাম আমার চেনা জায়গা। দহিজুড়ির পরেই গিধনি, যেখানে ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বিশাল আশ্রম। সড়কপথে যাতায়াতের সময় দহিজুড়ি হয়েও যাওয়া আসা যায়। তেমন প্রত্যন্ত না হলেও গরিব গ্রাম, বাদল সেখানকার মানুষ। তার কোনও গ্রাম্যতা ছিল না বটে, কিন্তু তার সরল সহজ চরিত্রের মধ্যে গ্রামের নির্ভুল ছাপ ছিল। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে তার কোনও দ্বিধা কখনও দেখিনি। দীর্ঘদিন কলকাতায় বাস করেও সে শহুরে ভানভর্ণিতা অর্জন করেনি, ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘুরিয়ে কথা কওয়ার অভ্যাসও তার ছিল না। ফলে কখনও কখনও তাকে রূঢ়ভাষী বা অবিনয়ী বলে কারও কারও মনে হতেই পারে। হয়েছেও। কিন্তু কাউকে সে ঝুলিয়ে রাখত না, যা বলার সপাটে বলে দিত। তাতে কিন্তু কারও সঙ্গেই তার সম্পর্ক খারাপ হত না। দহিজুড়িতে বাদল যেত পুজোর ছুটিতে। আর তখন তার বাড়িতে মাঝে মাঝেই হানা দিত তার কবি সাহিত্যিক বন্ধুরা। শক্তি, সুনীল এবং আরও অনেকে। বিস্তর হুজ্জোত-হুল্লোড়ও হত। শক্তিকে যারা জানে তারাই বুঝতে পারবে যে, এই অসামান্য প্রতিভাবান কবিটি মদ্যপান করলে কেমন বেহেড হয়ে যেত। তখন তার মুখের বা আচরণের কোনও আগলবাগল থাকত না।

বাদলের নিরীহ নিপাট পরিবারে সে যখন সেই মূর্তিতে হাজির হত তখন সিঁটিয়ে যেত সকলে। বাদল সেই গল্প যখন বলত তখন কিন্তু বিরক্তি নয়, বরং স্নেহই ঝরে পড়ত তার কণ্ঠস্বরে।

বন্ধুকৃত্য তাকে নানা ভাবে নানা সময়ে করতে হয়েছে। বাদলকে বন্ধুদের সঙ্গে বহু বার মদ্যপান করতে দেখেছি, কিন্তু কখনও একবারের জন্যও মাতাল হতে দেখিনি। বরং মদ্যপান করার পরেও নিজে গাড়ি চালিয়ে অনেক বেহেড মাতাল বন্ধুকে বাড়ি পৌঁছে দিত সে। গাড়ি বাদল চমৎকার চালাত। তবে সর্বদাই একটু বেশি গতিতে। মাথা ঠান্ডা ছিল বলেই বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেনি।

নিজের সম্পর্কে এত কম কথা বলত সে যে, সেটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তবে জিগ্যেস করলে যা বলার অকপটে বলত। রাখঢাক ছিল না পরিবারের অভাব অনটন বা সমস্যা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। নিজের জীবনসংগ্রামের কথাও সে কদাচিৎ বলত। আর তার হাসিটা ছিল দিলখোলা, আনন্দময়।

ফণীবাবু যদিও আনন্দ পাবলিশার্সের কর্তাব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু বাদলই ছিল তাঁর কার্যনির্বাহী মানুষ। ছাপাখানার সব খুঁটিনাটি কাজ বাদল হাতেকলমে করেছে। ফলে তার অভিজ্ঞতাও ছিল ব্যাপক। আর তখনকার নামীদামি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রকাশনা সূত্রেই তার ঘনিষ্ঠতা। ফলে প্রকাশনার চাবিকাঠিটি ছিল বাদলের আয়ত্তে। ফণীবাবু অবসর নেওয়ার পর তাই দায়িত্ব তারই ওপর অর্শায়। কিন্তু কর্ণধার হওয়ার পরেও তার আচার ব্যবহারের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখিনি।

প্রতি বছর তাকে বিদেশে যেতেই হত। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা হত আমাদের পুজোর সময়টাতেই। ওই সময়ে বিদেশে থাকতে কারই বা ভালো লাগে। কিন্তু বাদল কখনও কর্তব্যে পরান্মুখ ছিল না। কাজ তার কাছে বরাবর অগ্রাধিকার পেয়েছে। মাঝে মাঝেই তাকে বিদেশে নানা সম্মেলনে বইয়ের সম্ভার নিয়ে যেতে হয়েছে। ইংল্যান্ডে, আমেরিকায়। হাসিমুখেই গেছে সে।

সেবার সস্ত্রীক লন্ডনে বাংলাদেশি এক সংস্থার আমন্ত্রণে আমাকে যেতে হয়েছিল। মুশকিল হল, সেই সংস্থার কর্ণধার এবং প্রধান উদ্যোক্তা হঠাৎ মারা যাওয়ায় তারা অর্থসংকটে পড়ে যায়। ফলে আমাদের ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তারা সমস্যায় পড়ে। প্রথমে আমরা দু-তিন দিন এক ভারতীয় বাঙালির

আগ্রহে তাদের বাড়িতে ছিলাম। কিন্তু সেখানে স্থানাভাব ছিল। আমার মনে হয়েছিল সেই বাড়িতে বেশিদিন থাকলে তাদের বিব্রত করা হবে। সেই সম্মেলনে বইয়ের পসরা নিয়ে বাদলও গিয়েছিল। বাদল আমার সমস্যার কথা শুনে বলল, আরে, আমি যেখানে আছি তিনি তো পেয়িং গেস্ট রাখেন। টাকা বেশি লাগবে না। চলে আসুন। বাদলের পরামর্শে তাই নাগচৌধুরীর বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম। ব্যবস্থা বেশ ভালো। আর আমন্ত্রণকর্তারা টাকা না-দিতে পারলেও আমার কাছে যা পাউণ্ড ছিল তা দিয়েই ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। সেইখানে দিব্যি বাদলের সঙ্গে হইহই করে কয়েকটা দিন কাটানো গিয়েছিল। আর ডিভোর্সী এবং একা নাগচৌধুরীও সেই আড্ডায় শামিল হতেন। দেখলাম, বিদেশ গমনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বাদল নানা সুলুকসন্ধান জানে। ইংল্যান্ডে তার চেনাজানা অনেকেই ছিল, কিন্তু সে কারও আশ্রয়ের প্রত্যাশা করত না। সাধ্যমতো নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিত।

বিদেশে একাধিকবার বাদলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কোনও উদ্বেগ নেই, সমস্যা নেই। দিব্যি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত সে। কখনও ভুলত না যে, সে একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, বেড়াতে নয়। প্রতিদিন যথাসময়ে বইয়ের স্টল খুলে বসত এবং সারাক্ষণ ক্রেতা সামলাত। হাসিমুখে, সহৃদয়তার সঙ্গে। সময়মতো আড্ডাও দিত মদও খেত, কিন্তু কখনও কাজে ফাঁকি দিয়ে নয়। এরকম কর্মী মানুষ আমি কমই দেখেছি।

বাদলের বন্ধুবান্ধব বলতে সুনীল, শক্তি, দিব্যেন্দু, মতি, শ্যামল এবং কে নয়! অন্য দিকে নীরদ সি, সত্যজিৎ রায়, সন্তোষদা, নীরেনদা, রমাপদদা, সাগরদা, বিমলদা থেকে শুরু করে তাবৎ সারস্বত সমাজ। মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করত, হ্যাঁ বাদল, এই যে দিনরাত্রি কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আপনার কারবার, আপনার নিজের কখনও দু'ছত্তর কবিতা বা এক-আধটা গল্পটল্প লিখতে ইচ্ছে করে না? কথাটা বলা হয়নি সঙ্কোচের বশে।

বাদল যখন ফ্ল্যাট কিনবে বলে বিধান নিবাসে ফ্ল্যাট বুক করল, তখন আমার ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্নও দেখার কথা নয়। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। যখন জানলাম ফ্ল্যাটের দাম ষাট হাজার টাকা তখন মূর্ছা যাই আর কী। পরে এসকালেশনের ফলে প্রায় আশি হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফ্ল্যাটের দাম। তিনতলার ওপরে আলো-হাওয়ার অফুরন্ত সরবরাহ। জানলা খুললেই বিধান শিশু উদ্যানের সবুজে সবুজ। বাদলের বাসাটি দেখে আমি মুগ্ধ। বউ আর দুটি মেয়ে নিয়ে সেখানে তার সুখের সংসার। বড় হলঘরটির এক ধারে বুক-কেস দিয়ে ঘেরা ছোট বসার ঘর। বাদলের বউ অতিশয় সুশীলা, ধীরস্থির, গোছানো মেয়ে। সাবেক গিন্নিবান্নিদের মতোই সংসারী। সম্ভবত হোমফ্রন্টটি নিশ্ছিদ্র নিরাপদ ছিল বলেই বাদল কাজকর্মের ওই দানবীয় শক্তি অর্জন করতে পেরেছিল। অন্তত পরিবারের কারণে তাকে কোনও উদ্বেগ পোহাতে হত না।

কবি লেখকদের যে-কোনও উদ্যোগেই বাদল শামিল থাকত। সুনীলের বুধসন্ধ্যা হোক, আত্মীয়সভা হোক বা আর যা-কিছু বাদলকে ছাড়া কারওই চলত না। লেখকদের দায়ে দফায় সংকটে, আপদে-বিপদে, অসুখ-বিসুখে বাদল সর্বদাই উপস্থিত থেকেছে। আর কারও নিমন্ত্রণেই কখনও গরহাজির থাকেনি।

আমার জীবনযাত্রা একটু আলাদা ধরনের। মদ্যপান দুরস্থান, আমার বাসায় মাছ-মাংস-ডিম-পেঁয়াজ-রসুনও ঢোকে না। ফলে আমার বন্ধুরা আমার বাড়িতে বড় একটা আড্ডা দিতে আসত না। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে আসত। সেভাবে বাদলও এসেছে। সে খেতে ভালোবাসত। কিন্তু আমি তাকে কী-ই বা খাওয়াতে পারি? লুচি, পরোটা, মিষ্টি কারই বা মুখে রোচে? তবু সেসব সে আদর করেই খেয়েছে। নাক সিটকোয়নি। বাদলের জীবনের দর্শনটাই ছিল যখন যেমন, তখন তেমন। সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতাটি ছিল তার জন্মগত।

একবার একটা ঘটনার কথা বাদল নিজেই আমাকে বলেছিল। সেটা বেশ অনেকদিন আগে। তখন তার ছোট মেয়ের বয়স বোধহয় তিন বা চার হবে। সেই মেয়েকে নিয়ে স্কুটারে করে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে কোনও কাজে আসছিল সে। স্কুটারটি হঠাৎ স্কিড করায় বাদল গাড়ি সমেত পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। রাস্তার

লোকজন ছুটে এসে তার পরিচর্যা করার পর বাদলের জ্ঞান ফিরে আসে। চোট খুব বেশি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সাময়িক বিস্মৃতির ফলে সঙ্গে যে তার মেয়েটি ছিল, তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে স্কুটার নিয়ে অফিসে চলে আসে সে এবং কাজে বসে যায়।

ওদিকে তার বাচ্চা মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার বাবার নামটি জানতে পারে। বাদলকে বইপাড়ায় সবাই চেনে। সুতরাং একজন ছুটে গিয়ে বাদলকে বলে, বাদলবাবু, আপনার সঙ্গে কি আপনার বাচ্চা মেয়েটি ছিল? তখন বাদলের সংবিৎ ফেরে এবং সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

ঘটনাটি এই কারণেই বললাম যে, মেয়ের কথা ভুলে গেলেও বাদল কিন্তু তার অফিস বা কাজের কথা ভোলেনি!

অবসর নেওয়ার পর সে বেশ আনন্দেই সময় কাটাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হত। সে বলত, ফার্স্ট ক্লাস আছি শীর্ষেন্দু। অনেক বইটই পড়ছি, আড্ডা মারছি।

সত্যিই, তার দুই মেয়ের ভালো বিয়ে হয়ে গেছে। নাতি-নাতনি হয়েছে, তার তখন অবাধ জীবন। কিন্তু নির্মেঘ আকাশে হঠাৎ ঝটিকার আভাস দেখা দেবে কে জানত। বাদলের ক্যানসার হয়েছে এ খবরটা কে যে আমাকে দিয়েছিল আমার মনে নেই। তৎক্ষণাৎ বাদলকে ফোন করলাম। বাদল অতি নিরুত্তাপ গলায় বলল, হ্যাঁ ভাই, লাংসে দুটো স্পট পাওয়া গেছে। দেখা যাক কী হয়। যেন ব্যাপারটা সর্দিকাশির মতোই তুচ্ছ জিনিস।

বাদল মুম্বই গেল। দীর্ঘ চিকিৎসা চলল। মাঝখানে একবার ফোন করতেই বলল, হ্যাঁ, ভালোই আছি। তবে কী জানেন, আমার বয়স এখন আটাত্তর, দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, দায় দায়িত্ব তেমন কিছু নেই। মরতে আমার কোনও ভয় নেই।

আমি সেটা জানি। বাদলের মতো অকুতোভয় মানুষ আমি বড় একটা দেখিনি। সবচেয়ে বড় কথা, তার যে মৃত্যুভয় নেই, একথা সে বলল এত স্বাভাবিকভাবে যেন মৃত্যু কিছুই নয়, বাজার করতে যাওয়ার মতোই একটা ব্যাপার।

লীলা দি

লীলাদির সঙ্গে ঠিক প্রথম পরিচয় কবে হয়েছিল মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে খুব যে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়েছিল এমন নয়, ক্যাজুয়ালি হয়েছিল। আসলে লীলাদি তো অভিজাত পরিবারের মানুষ, চৌরঙ্গি ম্যানসনে থাকেন আর আমি ছিলাম একদম ছাপোষা। স্কুল মাস্টারি করি তাই বরাবরই একটা জীবনযাপনগত দূরত্ব ছিল। তবে একজন পাঠকের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের থেকেই আরও বড় পরিচয় তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লীলাদি আমার ভীষণ ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর পাঠক হিসেবে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি সারাটা জীবন।

রায় পরিবারের সবার গদ্য লেখার এক নিজস্ব স্টাইল ছিল, সেটা হল ঝরঝরে গল্প বলার সহজাত দক্ষতা। সেই দক্ষতা উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সত্যজিত রায়ের যেমন ছিল তেমন লীলা মজুমদারেরও ছিল, লীলাদিও খুব দ্রুত গল্প নির্মাণ করতে পারতেন। লীলাদির আর একটা ক্ষমতা ছিল, সেটা হলো সহজ মিষ্টি হিউমার সৃষ্টি করার দক্ষতা। এটা খুব বড় গুণ, হিউমার সকলের করায়ত্ত নয়। এটা একটা আলাদা গুণ, ওঁর পরিবারের সকলেরই ছিল। আর লীলাদির লেখায় অদ্ভুত আন্তরিকতা ছিল, এই বৈশিষ্ঠ্যটা আমি অন্য কারোর লেখায় লক্ষ্য করিনি। তবে একটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি, লীলাদির লেখা পড়লে বোঝা যেত উনি আমাদের গ্রামবাংলাকে খুব একটা ভালোভাবে চিনতেন না। যেহেতু উনি অভিজাত পরিবারের মেয়ে, ছোটবেলা থেকেই শহরে কেটেছে তাই ঠিক গ্রাম্যজীবনটা কেমন সেটা ওঁর জানা ছিল না। একটা মজার উদাহরণ দিই, উনি গ্রাম নিয়ে লিখছেন, যখন গ্রামে সরাইখানার কথা বলছেন, কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামে কিন্তু সরাইখানা নেই। সরাইখানা আছে বিদেশে, নানা গল্পে পড়েছি ঘোড়ায় করে এসে কেউ সরাইখানায় খাওয়াদাওয়া করল, রাত কাটালো। আমাদের গ্রামে সরাইখানা ভাবাই যায় না। আরও একটা জিনিস উনি লিখতেন যে সরাইখানায় এসে সবাই খিচুড়ি-মাংস খাচ্ছে। এই কম্বিনেশনটা নিশ্চয় ওঁর খুব প্রিয়, বারংবার সুস্বাদু খাদ্য বলতেই উনি খিচুড়ি-মাংসের কথা বলেছেন। খুব মজা পেতাম এগুলো পড়ার সময়। এপ্রসঙ্গে পদিপিসির বর্মিবাক্সের কথা বলি, এই গল্পে তাঁর অনভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। আমরা যে পরিবেশে বসবাস করি, সে প্রসঙ্গে তাঁর বাস্তব ধারণা আবছা ছিল যে কারণে গল্পটা অনেক ক্ষেত্রেই আরোপিত মনে হয়। তবুও লীলাদির লেখা আমাকে সবসময় আকৃষ্ট করত ওঁর লেখনীর কারণে। আমি যে খুব ছোটবেলায় লীলাদির লেখা পড়েছি এমন নয়, লীলাদির ছোটদের লেখাগুলো আমি পড়েছি অনেক বড় বয়সেই। সেই সমস্ত লেখার মধ্যেই জীবনকে দেখার অদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছি। তবে একটা ব্যাপার, একদম মফসসলের বা গ্রামের গরিব ছেলেমেয়েরা যে পরিবেশে বড় হয়েছে, তারা লীলাদির লেখা খুব একটা উপভোগ করবে না, কেননা লীলাদির লেখায় একটা আভিজাত্যের ছাপ ছিল। যেমন 'হলদে পাখির পালক' একদম ছোটদের

জন্য নয়, সবার জন্য নয়, একটু ম্যাচুয়রিটি না থাকলে সে লেখা সবাই বুঝবে না, সবাই উপভোগ করবে না।

তবে লীলাদির লেখার সঙ্গে আমার লেখার সঙ্গে একটা মজার মিল আছে, সেটা হল আমাদের ভূতেরা ভীষণ উপকারী, তারা কখনো কারোর অনিষ্ঠ করে না। লীলাদির মতো আমার লেখাতেও কোনো খুনখারাপি, নিষ্ঠুরতা নেই। আমি যেহেতু লিখছি বাচ্চাদের জন্য তাই তাদের আমি নিষ্ঠুর পৃথিবীর অনেক কিছুই আড়াল করতে চাই। তারা একদিন বড় হবে তখন সবই বুঝবে তবে যতদিন ওদের শৈশব আছে ততদিন সেটা নির্মলভাবে উপভোগ করতে দেওয়াটাই আমাদের উচিত। তাই আমি সবসময় জীবনের মজার দিকটা বাচ্চাদের সামনে তুলে ধরি। এই বৈশিষ্ঠ্যটা লীলাদির লেখাতেও পেয়েছি, পরিশোধিত হাস্যরসের মাধ্যমে উনি লেখাটাকে বিবৃত করতেন। এটা খুব রেয়ার একটা গুণ, এটাকে আমি খুব সম্মান করি।

আশাদি ছিলেন সাহসি ঔপন্যাসিক

এক কথায় আশাপূর্ণা দেবী বিংশ শতকের মহিলা বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসি ঔপন্যাসিক, ছোটো গল্পকার। যদিও ওঁর শুরুটা হয়েছিল, একটু দেরিতে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবন, বিশেষত সাধারণ মেয়েদের জীবনযাপন ও মনস্তত্ত্বের চিত্রই ছিল তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। ব্যক্তিজীবনের নিতান্তই এক আটপৌরে মা গৃহবধূ আশাদি ছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। যতদূর জানি বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল না। পারিবারিক কারণে বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রথাগত শিক্ষালাভেও। কিন্তু গভীর অন্তদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকার আসনে বসিয়েছিল। তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা উপন্যাসত্রয়ী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওঁর একাধিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র। ওঁর ছোটোবেলা কেটেছে উত্তর কলকাতাতেই ঠাকুরমা নিস্তারিনী দেবীর পাঁচ পুত্রের একান্নবর্তী সংসারে। পরে অবশ্য আপার সার্কুলার রোডের (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) নিজস্ব বাসভবনে উঠে আসেন ওঁরা। কিন্তু বাল্যের ওই কয়েকটি বছর তাঁর মনে গভীর ছাপ রেখে যায়।

শুনেছি এক স্মৃতিচারণায় আশাদি বলেছিলেন, '...ইস্কুলে পড়লেই যে মেয়েরা...বাচাল হয়ে উঠবে, এ তথ্য আর কেউ না জানুক আমাদের ঠাকুমা ভালোভাবেই জানতেন, এবং তাঁর মাতৃভক্ত পুত্রদের পক্ষে ওই জানার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ছিল না।'

তবে এটা হয়তো অনেকেই জানেন যে এই প্রতিকূল পরিবেশেও মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে দাদাদের পড়া শুনে শুনে শিখে গিয়েছিলেন পড়তে। বর্ণপরিচয় আয়ত্ত করেছিলেন বিপরীত দিক থেকে। ওঁর মা ছিলেন একনিষ্ঠ সাহিত্য-পাঠিকা, সেই সাহিত্যপ্রীতি তিনি তাঁর কন্যাদের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। ওঁর মা সরলাসুন্দরী ছিলেন স্বনামধন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জ্ঞানপ্রকাশ লাইব্রেরি ও চৈতন্য লাইব্রেরির সদস্য। বাড়িতে সে যুগের সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারও ছিল ওঁদের। এই অনুকূল পরিবেশে মাত্র ছয় বছর বয়স থেকেই পাঠ্য ও অপাঠ্য নির্বিশেষে পুরোদমে পড়াশোনা শুরু করে দেন আশাপূর্ণা।

পরবর্তী কালে এই বাল্যকাল সম্পর্কে একবার আশাদি বলেছিলেন, 'হিসেব মতো আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে, সংসার উর্ধ্বের একটি স্বর্গীয় জগতে। বই পড়াই ছিল দৈনিক জীবনের আসল কাজ।'

একজন ভালো মানুষ

নবনীতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঠিক কবে অথবা কীভাবে, সেটা ঠিক মনে নেই কেননা সে প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা। কিন্তু সেই প্রথম দেখা হওয়ার পরেও মাঝখানে অনেকগুলো বছর দেখা হয়নি। বিয়ের পর সে বিদেশে থাকত। তারপর তো অনেক ঘটনা ঘটল আর ও কলকাতায় ফিরে এসে 'ভালো-বাসা'য় থাকতে শুরু করল আর যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা শুরু করল। তখন ওর সাথে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হত। আরও একটা মজার ব্যাপার নবনীতা নিজে গাড়ি চালিয়ে যাদবপুরে যেত। সেই আমলের পক্ষে এটা অনেক আধুনিকতার পরিচয়। একবার একটা অনুষ্ঠানে আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'নবনীতা গাড়ি চালিয়ে চলে যেত। আর আমরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখতাম। তখন মনে হত যে, ও দুটি চোখে তাৎক্ষণিকে পরশপাবকই যৎসামান্য।' কথাটা শুনে নবনীতা খুব হেসেছিল।

আমার সঙ্গে দেখা হলেই অনেক কথা বলত নবনীতা। কথা বলতে ভালোবাসত। কোনও আজেবাজে কথা নয়, আসলে ওর কথা শুনতে আমি ভালোবাসতাম। ও যেমন হাসত, হাসাতেও পারত।

নবনীতার লেখা সম্পর্কে আমি বরাবরই কনসাস ছিলাম, কেননা নবনীতা বড় ভালো লিখত। কবিতা-গল্প উপন্যাস তো বটেই, ও ছোটদের জন্যও গল্প লিখেছে প্রচুর। অনেকেই জানেন না, ও অসাধারণ রূপকথা লিখতে পারত। আমি ওর রূপকথার বই পড়েছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। ও তো ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের মধ্যে লালিত পালিত। নরেন্দ্র দেব-এর লেখা আমি পড়েছি। রাধারানী দেবী অপরাজিতা ছদ্মনামে লিখতেন। আমি একবার 'দেশ' পত্রিকার জন্য ওঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, ওঁর আশি বছর বয়স যখন।

নবনীতা তো ভীষণ সুন্দরী ছিল, বিদূষী ছিল। বিদেশে পড়াশোনা করেছে। সবমিলিয়ে বর্ণময় একটা চরিত্র। আরও একটা স্বভাব ওঁর দেখেছি, ঘুরতে খুব ভালোবাসত। সারা পৃথিবী ও যে কত বার করে ঘুরেছে, তার ঠিক নেই। দুরারোগ্য রোগে ভুগছে জেনেও এখানে ওখানে চলে যেত। আসলে ও অকুতোভয় মেয়ে। হাঁটতে খুব অসুবিধা হত। লাঠি নিয়ে ঘুরত। কিন্তু শরীর নিয়ে ওর আলাদা কোনও 'আহা উহু' ছিল না। কোনও অভিযোগও করত না। ওর মানসিকতা, রুচি, তীব্র জেদ—সব দিক দিয়েই ওকে ভালো লাগত আমার। ওর কথা বলে শেষ হবে না।

নবনীতা খুব বড় মনের মানুষ ছিল। লোকজন খুব ভালোবাসত। ওঁর মেয়েরা কর্মসূত্রে বাইরে চলে যাওয়ার পর খুব একা হয়ে গিয়েছিল। তখন ওর বাড়িতে অনেক আশ্রিতা থাকত। তাদেরকে সে মেয়ে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসত। এই যে লোককে আপন করে নেওয়া, এটাই একটা বড় ব্যাপার ছিল।

আমি মাঝে মাঝে রসিকতা করে বলতাম, নবনীতা হল এমন এক জন মানুষ যার পুরো পরিবারই বিখ্যাত! বাবা বিখ্যাত, মা বিখ্যাত, স্বামী বিখ্যাত, মেয়েরাও খ্যাতিনামা। এক অদ্ভুত ধরনের খ্যাতিমান পরিবার, যে পরিবারের সকলেই বিখ্যাত। ওরা যার যার নিজের ক্ষেত্রে বিখ্যাত।

ও দীর্ঘ দিন হাঁপানিতে ভুগেছে। ইনহেলার নিয়ে ঘুরত। অথচ শরীর নিয়ে কিছু জিগ্যেস করলে হয়তো বা বিরক্ত হত, বলত, ও কিছু না। আসলে, শারীরিক কোনও সমস্যাকেই ও বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইত না। এই যেমন আলাস্কার মতো জায়গায় নবনীতার মতো হাঁপানি রোগী চলে গেল। ঘুরেও এল। ও একাধিকবার আলাস্কায় গিয়েছে।

ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা প্রায় দেড়বছর আগে, একটা অনুষ্ঠানে। মনে আছে, আমি গাড়ি নিয়ে ওঁর বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছি। ওঁর নামতে অনেক দেরী হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সেই চেয়ারে বসে সিঁড়ি দিয়ে নামল। আর নামার পরেও বাড়ির দরজা থেকে গাড়ি পর্যন্ত আসতেও অনেক সময় লাগল। আমি দেখেই আঁতকে উঠে বললাম, 'এ কি অবস্থা হয়েছে আপনার!' ও কোনও উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। শরীর খারাপ নিয়ে কিছু বলতেই চাইত না।

ওর এই চলে যাওয়াটা অপূরণীয় ক্ষতি। ওকে নিয়ে আলাদা কোনও আদিখ্যেতা ছিল না, কিন্তু শ্রদ্ধা করতাম। নবনীতা এক বর্ণময় চরিত্র। নবনীতার কলমটা থেমে গেল। আরও কিছু দিন ওর কলম চলতে পারত। এই চলে যাওয়া ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসেবেও এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করি।

সুচিত্রা

সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে সেই কবে থেকে চিনি। চেনা হয়েছিল প্রয়াত স্নেহভাজন রাধানাথ মণ্ডলের মাধ্যমে। তখন রাধানাথ এবং তার সমবয়সি বন্ধু লেখকরা গল্পচক্র বলে একটি গল্পের আসর করত। গল্পপাঠ এবং আড্ডা হত সেখানে। সুচিত্রার আবির্ভাব সেই সূত্রেই। গল্পচক্রের সদস্য ছিল অনেকে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ সম্ভাবনাময় ছিল। কিন্তু ঝটিতি উত্থান ঘটল সুচিত্রার। হঠাৎ দেশ আনন্দবাজার রবিবাসরীয় এবং পরবর্তীকালে নানা বড় কাগজে তার লেখা বেরোতে থাকে।

এই উত্থানটি স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু কোনও আকস্মিক ভাগ্যবলে ঘটেনি। সুচিত্রা যে তার লেখক বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কলমধারী, তা তার এক-আধটা লেখা পড়েই বুঝতে পারা গিয়েছিল।

ছোটখাটো ভারী মিষ্টি চেহারার মেয়েটি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন ভারিক্কী গেজেটেড অফিসার। মুখে প্রায় সর্বদাই পান এবং হাসি। সুচিত্রার হাসিটা দেখলেই আমার মনটা যেন জুড়িয়ে যেত। সত্যিকারের হৃদয়খোলা হাসি তো আজকাল বিশেষ দেখি না। আর হাসিখুশি মানুষ কার না পছন্দ?

সুচিত্রার গল্প উপন্যাসের প্রকৃত মূল্যায়ন উপযুক্ত মানুষ উপযুক্ত সময়ে করবে। সেই প্রসঙ্গে যাওয়াটা এখনই ঠিক হবে না। তবে আমার স্ত্রী আমাকে প্রায়ই সুচিত্রার লেখার ভূয়সী প্রশংসা করে পড়তে তাগাদা দিতেন। আমি নানা ব্যস্ততার মধ্যে সমসাময়িক লেখকদের লেখা সবসময়ে পড়ে উঠতে পারি না। গিন্নির প্ররোচনায় সেবার শারদীয়া দেশ-এ সুচিত্রার সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসটি পড়ে ফেললাম। এবং ভারী অবাক হয়ে গেলাম। একথা স্বীকার করি যে লেখায় সুচিত্রা বড় একটা ভাষা, প্রকরণ বা শৈলী নিয়ে তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেনি, তার লেখার ধরণ ছিল সাবেকী। কিন্তু গদ্যটি ছিল ভারী সরেস। যে উপন্যাসটি পড়লাম তা একজন কলেজের অধ্যাপক এবং তার সহকর্মী, পরিবার, সমাজ, ও সময়কে নিয়ে। কী যে ম্যাজিক ছিল তার বর্ণনায় কী বলব। আমার গিন্নিই সুচিত্রাকে ফোন করে আমার ভালো লাগার কথা জানালেন, আমার সঙ্গে কথা হল, সুচিত্রা বালিকার মতো খুশি হয়েছিল।

একটা সময়ে কম বয়সে আমি সংগ্রামী পাঠক ছিলাম, কত সময়ে পড়তে পড়তে রাত কেটে গেছে প্রায়। কিন্তু ক্রমে কাজ এবং নানা কারণে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া বা অন্যান্য ব্যস্ততায় পড়া লাটে উঠেছে, আর সেটা আমার কাছে খুবই দুঃখের ব্যাপার।

আমি খুব বেশি পড়ার সময় পাইনা বটে, কিন্তু সাহিত্য জগতের খবর তো পাই। সুচিত্রার প্রথম আবির্ভাবের পর কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাসের ব্যাপক প্রশংসা আমাদের কানে আসতে থাকে। একজন নতুন লেখিকার বরাতে এরকম সাধুবাদ জোটা খুব সাধারণ ব্যাপার তো নয়। ওর লেখার ভিতরে যে অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠত তা এক কথায় নিবিড় এবং পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ।

সুচিত্রা লহমায় বাঙালি পাঠক পাঠিকার হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। দেশ দফতরে মাঝে মাঝে হাজির হত সে। তাকে দেখলেই মনে হত, এ যেন আমার স্নেহের সহোদরা, আমাকে সে তার ব্যাগ খুলে পান-জর্দা খাওয়াত। পরে পান ছেড়ে পান মশলা ধরেছিল। তার কাছে তাও বহুবার খেয়েছি।

একবার একজন অ্যাকটিভিস্ট মেয়ে আমাকে বলেছিল, তারা তাকে একটি নারীবাদী সভায় নিয়ে যেতে গিয়েছিল। সুচিত্রা তাকে নাকি বলেছিল, হ্যাঁ রে তোরা কি পুরুষ মানুষদের দেখতে পারিসনা। কিন্তু ভাই, কিছু মনে করিস না, আমি কিন্তু আমার বরটাকে বড্ড ভালোবাসি, আমার তো পুরুষমানুষদের ওপর তেমন রাগ হয় না।

সুচিত্রা আমাদের বাড়িতেও কয়েকবার এসেছে। প্রথম প্রথম আমাকে এত সমীহ করত যে আমার সামনে সহজ হতে পারত না, আমিই তার সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা করে তার আড় ভেঙে দিই। আমি তার কাছে তার বর মেয়ে আর ভাইয়ের গল্প শুনতাম। সুচিত্রা মনে যতই আধুনিক হোক, সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই চিরকালীন বঙ্গললনা।

আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়ে যখন ব্লু মাউন্টেন সুইসাইড পয়েন্ট বা অন্যান্য ক্লেশদায়ক টুরিস্ট স্পট দেখে বেড়াচ্ছিলাম, তখন সেখানকার লোক পরম বিস্ময়ে আমাকে বলে আপনি পাহাড় টাহাড়ে উঠছেন, এত হাঁটছেন, আর কোনও লেখক তো এমনটা করেনি, সুনীল, সুচিত্রা, জয় গোস্বামী কেউ এত ঘোরেননি।

শুনে ফিরে এসে আমি সুচিত্রাকে বকুনি দিয়েছি, অস্ট্রেলিয়া গিয়ে ঘরে বসে থাকার মানে হয়? ও তখন হেসে বলেছিল, আসলে আমার শরীরটা তেমন ভালো ছিল না।

শরীর যে ভালো নয় তা সুচিত্রা প্রায়ই বলত। হার্টের কী একটা গণ্ডগোল ছিল, মাঝে মাঝে নার্সিংহোমে ভর্তি হত বলে শুনতে পেতাম।

প্রায়ই পাড়ি দিত মেয়ের কাছে ব্যাঙ্গালোরে। দুটি নাতি নাতনী ছিল তার প্রাণ। তাদের কণ্ঠস্বর ছিল সুচিত্রার মোবাইলের রিংটোন।

চাকরিটা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিল সুচিত্রা। লেখার রয়্যালটি থেকে তখন তার আয় ভালো, স্বামীও ভালো চাকরি করে। সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না।

তবু আমি জিগ্যেস করেছিলাম, লেখার জন্যই সে চাকরি ছেড়ে দিল কিনা। সুচিত্রা খুব স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে যা বুঝলাম, লেখাই বড় কারণ।

আশাপূর্ণা দেবীর লেখা যারা পড়েন তাঁরাই জানেন; গৃহবধু আশাপূর্ণা আশ্চর্য প্রতিভায় কি করে যেন সমাজের সব স্তরেই লেখাকে নিয়ে যেতে পেরেছেন। সুচিত্রা আশাপূর্ণার মতোই লিখত, এমন নয়। তবে আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যে যে জায়গাটা আলো করে ছিলেন, সেই শূন্যস্থান ভরাট করতে পারে একমাত্র সুচিত্রাই।

নৈহাটির যে দুর্ঘটনার সুচিত্রার ডান হাত ভেঙেছিল সেটা আমার কাছে বিশেষভাবে মর্মান্তিক, কারণ সেদিন নৈহাটিতে আনন্দ বিপণি উদ্বোধন করতে যাওয়ার কথা ছিল আমারই। শেষ মুহূর্তে কি একটা বাধ্যবাধকতায় আমার যাওয়া সম্ভব হল না। আমার বদলে গেল সুচিত্রা। সেখানেই বাথরুমে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়ে তার লেখার হাতটাই ভাঙল, খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, অবশ্য এই হাত ভাঙার ফলে সুচিত্রা কষ্ট করে কম্পিউটারে লেখাটাও শিখে গিয়েছিল, শেষ দিকে কম্পিউটারেই লিখত বলে শুনেছি।

মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে সুচিত্রাকে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল সেন্টারে দেখেছিলাম একটা পুরস্কার বিতরণী সভায়। সে শ্রোতা হিসেবে গিয়েছিল, মঞ্চে ওঠেনি, সুচিত্রা হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কথা হল না, তবে ভেবেছিলাম ওকে একটু বকুনি দিয়ে বলি এত মোটা হয়ে গেছ কেন? বড্ড আনফিট মনে হয়েছিল তাকে। সেই শেষ দেখা।

তার আকস্মিক চলে যাওয়াটা আজও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু শরীর গেলেও তার লেখার ভিতরে সে তো খুব বেশি করে জীবন্ত রয়েছে। বেঁচে আছে তার স্বামী, ভাই মেয়ে জামাই, নাতি নাতনীর ভিতর

দিয়েও। স্মৃতিতে ধ্যানে, মননে স্মরণে ধূপের গন্ধের মতো, সেও কি কম বেঁচে থাকা?

নক আউট

মফসসলবাসী এক বাঙালি বালকের জীবনে বক্সিংয়ের কী-ই বা ভূমিকা থাকতে পারে? তবু এই অচেনা খেলাটিকে ভালোবাসতে বাধ্য করেছিলেন, জো লুই। শুধু মুষ্টিযোদ্ধা নন, কৃষ্ণকায়দের আত্মমর্যাদাবোধেরও প্রতীক। আর এই খেলাটিকে সর্বোচ্চ শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি ক্যাসিয়াস ক্লে। ১৯৬০-এ রোম অলিম্পিকে লাইট হেভিওয়েট স্বর্ণপদকজয়ী ক্যাসিয়াস দীর্ঘকায় এবং সুপুরুষ। পেশাদার মুষ্টিকদের চেহারায় যেমন বন্য আগ্রাসন থাকে, চোখে ক্রুরতা, তা ক্যাসিয়াসের কখনওই ছিল না। একটু যেন কবির মতো দেখতে। একটু আধটু কবিতাও লিখতেন যে।

জো লুইয়ের পর কিছু দিন আমি বক্সিংয়ের খবরে তেমন কৌতূহল বোধ করতাম না। কারণ তখন শ্বেতকায় রকি ম্যার্সিয়ানো রাজত্ব করছেন হেভিওয়েট বক্সিংয়ে। এই ডানহাতি মুষ্টিক যত দিন বক্সিং করেছেন একতরফা জিতেছেন লড়াইয়ের পর লড়াই। অবশেষে অপরাজিত রকি অবসর নেন। আর তাঁর শূন্যস্থানে উঠে আসেন ফ্লয়েড প্যাটারসন—আর এক জন অতি আকর্ষণীয় মুষ্টিযোদ্ধা। ফ্লয়েড শুধু ভালো লড়িয়েই নন, অতিশয় ভদ্রলোকও। কিন্তু সোনি লিস্টনের মতো এক দানবীয় চেহারার বক্সার এসে প্যাটারসনের যে হেনস্থা করেছিলেন তা কহতব্য নয়। সোনির ওই বিপুল চেহারা আর আসুরিক শক্তিমত্তা আমার তেমন পছন্দ ছিল না। মনে মনে চাইতাম লিস্টন হারুন। কিন্তু তাঁকে হারাবে কে? কাগজে লিস্টনের একটা ছবি দেখেছিলাম, লড়াইয়ের আগে এক ডাক্তার তাঁর বুকে স্টেথো লাগিয়ে পরীক্ষা করছে। সোনির পাশে ডাক্তারটিকে পুতুলের মতো লাগছিল।

যে উঠতি ছোকরা অবশেষে লিস্টনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সার্কিটে উঠে এল, সে ক্যাসিয়াস ক্লে। গড়পড়তা বক্সারদের তুলনায় ছিপছিপে, ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা আর বেজায় বাক্যবাজ। মুখে মুখে ছড়া কাটায়, রঙ্গরসিকতায়, টিটিকিরি ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে দড়। আর মুখের জোরেই সে তখন অনেকটা খ্যাতি পেয়ে গেছে। সে নাকি বলে বলে নির্দিষ্ট রাউন্ডে প্রতিপক্ষকে নক আউট করে। তার কয়েকটা এ রকম চেতাবনি অবশ্য মিলেও গেছে। লিস্টন আর ক্লে-র সেই লড়াইয়ের রেকর্ডিং আমি একাধিক বার দেখেছি। দানব আর কবির লড়াই যেন। লিস্টন তেড়ে যাচ্ছে, আর লতানে গাছের মতো শরীর হেলিয়ে সরে সরে যাচ্ছে কবি ক্লে। শরীরটাই যেন ছন্দোবদ্ধ কবিতা। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে কেউটের মতো বাঁ-হাতের ছোবল লিস্টনকে নড়িয়ে দিচ্ছে, হতভম্ভ করে দিচ্ছে। প্রথমটায় মনে হচ্ছিল বেড়াল আর ইঁদুর। পরে কে বেড়াল আর কে ইঁদুর তা বোঝা যাচ্ছিল না, তবে সপ্তম রাউন্ডে লিস্টন আর তার টুল ছেড়ে উঠল না। দুজনের বিরাট লড়াইটা অনেকেই বলে, 'সাজানো'। হতেও পারে। তবে যে ঘুসিটা ক্লে মেরেছিল সেটার দ্রুততা অবিশ্বাস্য। সে নিজে বলেছিল, ওটা ফ্যান্টম পাঞ্চ। প্রথম রাউন্ডেই লিস্টন নক আউট।

ক্যাসিয়াস ক্লে নামটা আমার ভারী পছন্দ ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে ক্লে হলেন মহম্মদ আলি।

আলি সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদান করতে অস্বীকার করায় মার্কিন সরকার তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাঁর জেল ও জরিমানা হয়। মামলা লড়ে জেল এড়ালেও বর্ণময় ক্রীড়াজীবনের বারোটা বাজল। সর্বোচ্চ আদালত সর্বশেষে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল বটে, কিন্তু এক জন বক্সারের জীবন ততক্ষণে অনেকটাই ঢলে গেছে।

বক্সিং-এর মূল মঞ্চ থেকে এই নির্বাসন কতটা দুর্বিসহ, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু আলির যুক্তিও তো অকাট্য, আমি কেন ভিয়েতকংদের বিরুদ্ধে লড়ব, আমাকে তো তারা কখনও নিগার বলেনি! বহু দূরের এক দেশের অচেনা লোকেদের কেনই বা তিনি শত্রু ভেবে লড়াই করতে যাবেন?

এই ব্যক্তিগত লড়াইয়ের পাশাপাশি কালো মানুষদের অধিকারবোধ নিয়েও তো তাঁর আর এক ধরনের লড়াই ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং নানা সংগঠনে ঘুরে ঘুরে তিনি বিস্তর বক্তৃতা দিয়েছেন। আলি মুখর ছিলেন, অসামান্য বাগ্মীও ছিলেন। তাঁর ছিল সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ। অন্য মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো তিনি কেবল মুঠোসর্বস্ব ছিলেন না।

নিজের ধর্ম, নিজের পরিচয়কে আলি কতটা মর্যাদা দিতেন তার একটা ঘটনা হল, নর্টন নামে এক জন প্রতিপক্ষ তাঁকে ইচ্ছে করেই মিস্টার ক্লে বলে উল্লেখ করেছিলেন। রিং-এর নর্টনকে নক আউট করার আগে এক-একটা ঘুসি মেরে তিনি জিগ্যেস করতে থাকেন, হোয়াট ইজ মাই নেম?

খেতাব হারিয়ে হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে দু-দু'বার ফেরত আসার নজির একমাত্র আলির। তাঁর মুষ্টিক জীবনের শেষ দিকটায় অবিসংবাদী চ্যাম্পিয়ন ছিলেন জর্জ ফোরম্যান। এই ভয়ংকর মুষ্টিযোদ্ধার ধারেকাছে কেউ ছিলেন না। বয়সও অনেক কম। বলা হত, ফোরম্যান অপরাজেয়, বিধ্বংসী। আলি ফোরম্যানকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জায়গায় যখন উঠে এলেন, সকলেরই ধারণা হয়েছিল, আলি—বুড়ো আলি ফোরম্যানের সামনে স্রেফ উড়ে যাবেন।

১৯৭৪ সালে লড়াই হয়েছিল জাইরেতে, আফ্রিকায়। শুধু এই একটি লড়াই নিয়ে নরম্যান মেলার আস্ত একটা বই লিখেছেন। বইটা আমি কিনেওছিলাম। বইটার নাম ছিল 'দ্য ফাইট'। সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি এবং ঘটনার আনুপুঙ্খ বিবরণ পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে চোখে জল এসে যায়। দড়ির ওপর শরীরের ভর দিয়ে ঝুল খেয়ে খেয়ে মার এড়ানোর সেই কৌশলকে আলি নিজেই বলতেন 'রোপ আ ডোপ' ফোরম্যান তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করার জন্য প্রথমে থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বটে, কিন্তু ঘুষিগুলো হাওয়ায় ভেসে গেল বার বার আলিকে ছুঁতেই পারল না। ষষ্ঠ, সপ্তম রাউন্ডে যখন ফোরম্যান একটু ক্লান্ত, একটু মন্থর, তখনই দড়ির আশ্রয় ছেড়ে উঠে এলেন আলি। সেই চিরন্তন কালান্তক আলি, বিস্মিত ফোরম্যান এই আলিকে চিনতেন না। নক আউট।

আলি ছিলেন সর্ব অর্থে এক ক্লান্তিহীন যোদ্ধা। বক্সিং রিং এবং তার বাইরেও বক্সিং-এর নানা আঘাতের শিকার হয়ে বহু বছর তিনি শরীর ও বোধবৃত্তিতে খানিকটা পঙ্গু হয়ে কাটালেন, তাঁর বকবকানি বহু দিন শুনি না। কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ায় পৃথিবীটা অনেক বর্ণহীন আর নিস্তব্ধ লাগছে। চোখ বুজলেই শুনতে পাই, 'দে অল মাস্ট ফল, ইন দ্য রাউন্ড আই কল' শুনতে পাই, 'আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট।'

একা এবং নিঃসঙ্গ

দিয়োগা মারাদোনা প্রয়াত হলেন এই দুঃসংবাদ অনেককেই বিষণ্ণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মারাদোনা যেদিন ফুটবলের মাঠ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিনই জাদুকর মারাদোনার ভার্চুয়াল মৃত্যু ঘটে গিয়েছিল। শুধু শরীরে বেঁচে থাকাটাই তো প্রতিভাধরদের বেঁচে থাকা নয়, তাঁরা বেঁচে থাকেন কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে। তবে কর্মকাণ্ড শেষ হলেও তাঁরা বেঁচে থাকেন প্রেরণা হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, উদাহরণ হিসেবে। মারাদোনাও তাই ছিলেন। কিন্তু অবসর নেওয়ার পর মারাদোনা বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্তগুলোও পালন করতেন না। হয়ে উঠেছিলেন মাদকাসক্ত, উচ্ছৃঙ্খল, অস্থির। মাত্র ষাট বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণের কথাই নয়।

মাত্র পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি উচ্চতার মারাদোনা আন্তর্জাতিক ফুটবলারদের উচ্চতার ধারেকাছেও নন। গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মারাদোনা কিন্তু উচ্চতার খামতি কখনও বুঝতেই দেননি আমাদের। লোকে ছিয়াশির বিশ্বকাপের কথাই বলে, কিন্তু মারাদোনার বিস্তর খেলা দেখার সুবাদে এই ক্ষিপ্র, চতুর, কুশলী ফুটবলারের সাধু ও অসাধু নানা উপায়ে গোল করার ও করানোর ঘটনা দেখেছি। মুগ্ধ হয়েছি মারাদোনার আশ্চর্য গতিবেগ ও পায়ের শিল্প, শরীরের ভারসাম্য শটের নির্ভুল নিশানা দেখে। প্রায় পেলের মতোই গ্রেসফুল, জর্জ বেস্টের মতোই তাঁর ভৌতিক ড্রিবলিং। তবু এক-এক চুলের তফাতে আমি এগিয়ে রাখব পেলেকে এবং জর্জ বেস্টকে। আমার পছন্দের তিন নম্বর হলেন মারাদোনা। জর্জ বেস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার সুযোগ পাননি আয়ারল্যান্ডের খেলোয়ার ছিলেন বলে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবে খেলতেন। সত্যিই তাঁর খেলায় অলৌকিত্বের স্পর্শ ছিল। আর পেলে তো ফুটবল নিয়ে যা খুশি করতে পারতেনই। পেলের সম্মোহন থেকে আমি এখনও বেরতে পারিনি।

মারাদোনা এঁদের থেকে খুব পিছনে নন। বরং এঁদের গায়ে-গায়েই তাঁরও অবস্থান। তবে মারাদোনা খুব সাধু খেলোয়াড় যে নন, এটা তাঁর বড় ভক্তকেও স্বীকার করতে হবে। ছিয়াশির বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার সময় মারাদোনা যে হাত দিয়ে গোল করেছিলেন তা এখন 'হ্যান্ড অফ গড' হিসেবে কুখ্যাত। তবে ইংল্যান্ড বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও রেফারি গোলটি বাজেয়াপ্ত করেননি। এর ঠিক চার মিনিটের মাথায় মারাদোনা সেই পাঁচজন প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে বাঁ-পায়ের টোকায় জয়সূচক গোলটি করেছিলেন, যা শতাব্দীর সেরা গোল হিসেবে আজও বিবেচনা করা হয়। এই ম্যাচটি আমি সরাসরি দেখেছিলাম, সেই ঘোর আজও চোখে লেগে আছে।

'হ্যান্ড অফ গড' তাঁর একমাত্র চৌর্যবৃত্তি নয় কিন্তু। বহু ম্যাচে দেখেছি তিনি নির্দ্বিধায় হাত দিয়ে বল থামিয়ে পায়ে নিয়ে দৌড়চ্ছেন, বা পড়ে গিয়ে হাত দিয়ে বল ঠেলে পাস করে দিচ্ছেন। বেঁটে বলেই বোধ হয় তাঁর এসব কারসাজি রেফারিরা বুঝতে পারতেন না। আর তিনি তো অপরাধ কবুল করার লোকই নন। শুধু 'হ্যান্ড অফ গড' বলে তিনি যে গোলটিকে দাবি করেছিলেন সেটি ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাওয়ার, পরে

স্বীকার করে নেন। এসব সত্ত্বেও মারাদোনার অবস্থান এতই উচ্চতায় যে তাঁর সাত খুন মাপ হয়ে যায়। ছিয়াশির বিশ্বকাপের ফাইনালের কথাই ধরি। আর্জেন্তিনা আর জামানি দুই-দুই গোলে সমান যাচ্ছে, এমন সময় খেলার শেষের দিকে গোটা জার্মান দল চেপে ধরেছে আর্জেন্তিনাকে গোল হয়-হয়। ঠিক সেই সময়ে ধূর্ত মারাদোনা নিজেদের ডিফেন্স থেকে বল ধরে মাঝমাঠে ফাঁকায় ঠেলে দিলেন বলটাকে, বোধ হয় যোগসাজশ ছিলই, ঠিক একটা চিতাবাঘের মতোই ক্ষিপ্র বুরুচাগা পিছন থেকে দৌড়ে বলটাকে তাড়া করে এগিয়ে আসা গোলকিপারের মাথা টপকে বল নিয়ে গিয়ে গোল করলেন। অনবদ্য সেই গোল। ভোলা যায় না। বুরুচাগার যতটা কৃতিত্ব, ততটাই মারাদোনারও।

খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর মারাদোনা ক্রমে নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। ভুলভাল জীবনযাত্রার জন্য তাঁর মজবুত শরীরও ভেঙে পড়তে থাকে। মাদকাসক্তি বাড়ে, বাড়ে নানা অসুস্থতাও। বেশ কয়েকবার হাসপাতালে যেতে হয়েছে তাঁকে। মোটা, থলথলে অপটু হয়ে পড়তে থাকেন। তার মধ্যেই নানা বিতর্কিত মন্তব্য করে বসতে থাকেন। তাঁর আগ্রহ দেখে কিছুদিনের জন্য তাঁকে আর্জেন্তিনীয় দলের কোচও করা হয়েছিল। কিন্তু ভালো খেললেই ভালো প্রশিক্ষক হওয়া যায় না, এটা প্রমাণিত সত্য। এই ভুল পেলে করেননি। মারাদোনার কোচিংও তাই আর্জেন্তিনাকে এগিয়ে দিতে পারেনি।

সন্দেহ নেই যে, মারাদোনা ফুটবলকে অনেক কিছু দিয়েছেন। কিন্তু কখনও আর একটা মারাদোনা বা আরও একটা পেলে বা আরও একজন জর্জ বেস্ট হয় না, হবেও না। এই এক মুশকিল, একজন সুপারস্টারের বিকল্প জন্মায় না। তাই তাঁরা যে যাঁর মতো এক ও অদ্বিতীয় থেকে যান। তাঁদের নকল করা যেতে পারে, কিন্তু বিকল্প হওয়া সম্ভব নয়। তাই এঁরা যে যাঁর মতো একা নিঃসঙ্গ। আর এটাই এঁদের ট্র্যাজেডিও। লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলে যখন আর নিজের জয়ধ্বনি শোনা যায় না, যখন তাঁকে নিয়ে আর সেই মাতামাতি নেই, যখন জলপ্রপাতের মতো অবসাদ চলে আসে। আর এই পরিবর্তন যিনি শান্ত ও দৃঢ় মানসিকতায় গ্রহণ করতে পারেন, তিনি রক্ষা পান, যেমন পেলে। মারাদোনা বোধ হয় সেটাই পারেননি। পারলে মাদক নিতে হবে কেন তাঁকে? কেন এত বিষয়ে কথা বলতে হবে? কেনই বা অপটু শরীরেও নিতে হবে জাতীয় দলের প্রশিক্ষকের ভূমিকা?

তবু মারাদোনাকে উপেক্ষা করা যায় না, অশ্রদ্ধা আসে না, মারাদোনা নামটা শুনলেই মাথা নোওয়াতে ইচ্ছে করে।

সাহিত্য

ঘনাদা ৭৫

হিসেব করে দেখছি, ঘনাদার প্রথম গল্পটি লেখা হয়েছিল পঁচাত্তর বছর আগে। গত পঁচাত্তর বছরে পৃথিবীর অনেক রহস্যই অনাবৃত হয়ে গেছে, অনেক বিস্ময় আর বিস্ময় নেই। অনেক অজ্ঞাত এখন আমাদের জানার আওতায়। ফলে ঘনাদার বেশ কিছু গল্পের আবেদন ফিকে হয়ে গেছে। যেমন ব্রকোলি নিয়ে বাহাঁত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির বাসিন্দাদের যে বিস্ময় এবং অজ্ঞতা, তা আজকের পাঠকের কাছে কোনও বিস্ময়ের বস্তু নয়। ব্রকোলি আজ অতি পরিচিত একটি সব্জি। জিন সেঙের নামও আর কারও অপরিচিত নয়। তবু ওর মধ্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র ব্রকোলি কীভাবে উৎপন্ন করা হয়, সেটি উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন, যা এখনও আমরা অনেকেই জানি না। ঘনাদা গুলবাজ, এই আকাট সত্যটিকে সামনে ঝুলিয়ে রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্র কিন্তু বিস্তর জ্ঞানগর্ভ সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। নিয়মিত ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক পত্রিকাটি পড়তেন তো বটেই, বিজ্ঞানের হালফিল সব খবরও রাখতেন।

লেখক প্রয়াত হয়েছে '৮৮ সালে। ঘনাদার গল্প তখন থেকেই থেমে গেছে বটে, কিন্তু আজও তার অভিঘাত রয়ে গেছে। রয়ে গেছে, তার কারণ, গল্পের বাঙালিয়ানার বাতাবরণে কাহিনি বুননের বৈঠকি চাল। প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনও মেসবাড়িতে থেকেছেন কি না তা জানি না, তবে আমি দীর্ঘকাল হস্টেল, বোর্ডিং এবং মেসবাড়িতে থেকেছি। নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করে বলতে পারি, বাহাত্তর নম্বরের মেসবাড়িতে মধ্যবিত্ত বাঙালির মেসবাড়ির আবহ মোটেই নেই। দু'বেলা সেখানে এমন এলাহি এবং মহার্ঘ খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন থাকে, যা মেসবাড়ির মধ্যবিত্ত বাজেটে সম্ভবই নয়। তার ওপর ঘনাদার মন জোগাতে যে রাজসিক আয়োজন করা হয়, তার পয়সা কে জোগায় তাও এক প্রশ্ন। বিকেলে বিপুল জলখাবারের পর রাতেও প্রায় বিয়েবাড়ির নৈশভোজ খাওয়া পেটরোগা বাঙালির পক্ষে কী ভাবে সম্ভব, তাও প্রেমেনদাকে আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘনাদার গল্পে সব কিছুই লেখার গুণে সত্যাশ্রয়ী হয়ে ওঠে।

শুধু বিজ্ঞান আর ভূগোলই নয়, ঘনাদার অনেক গল্পে মহাভারতের নানা মজার ও অভিনবত্বে ভরা নতুন মূল্যায়নেরও অবতারণা করা হয়েছে। এই সব গল্প পড়লে বোঝা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র কত অভিনিবেশে মহাভারত পাঠ করেছেন এবং তা নিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণও করেছেন। এই প্রজ্ঞা বিস্ময়কর তো বটেই, নতুন করে ভাবনারও উদ্রেক করে। অথচ প্রেমেন্দ্র মিত্র একাধারে লেখক, কবি, চিত্রনাট্যকার, চিত্রপরিচালক, নাট্যকার নাট্যপরিচালক এবং আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এক জন সদাব্যস্ত মানুষ। শুনেছি, তিনি পাকা ব্রিজ খেলোয়াড় ছিলেন এবং প্রচুর খেলতেন। তার মধ্যেও মহাভারতাদি পুরাণগ্রন্থ আদ্যোপান্ত পড়তেও আটকায়নি! শুধু পড়াই তো নয়, তাতে নতুন আলোকপাতও করেছেন। এই মেধার দিশা পাওয়া কঠিন।

শিবু, শিশির, গৌড় আর সুধীর মোট চার জন স্থায়ী বাসিন্দা এবং ঘনাদাকে নিয়ে বাহাত্তর নম্বর মেসবাড়ি। তবে মাঝে মাঝে বাপি সমাদ্দার বা ওরকম আর কেউ কেউ মেসবাড়ির বাসিন্দা হয়েছে বটে, তবে মিশ

খায়নি এবং টিকতেও পারেনি। ঘনাদাই কুটকৌশলে তাদের তাড়িয়েছেন। কারণ ওই চার জন স্থায়ী বাসিন্দার প্রতি তাঁর বল্গাহীন পক্ষপাত। অন্য কেউ এই পরিমণ্ডলে ঢুকলে কেমন যেন তাল কেটে যায়, তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ঘনাদার গল্পের মূল ধারা বজায় রাখতে বেশি নতুনত্বের আমদানি করেননি। যত নতুনত্ব তা আমদানি করেছেন ঘনাদা কথিত অভিনব গল্পসমূহে।

ঘনাদা সমগ্রের সম্পাদক সদ্যপ্রয়াত সুরজিৎ দাশগুপ্তর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রর ডাকনাম ছিল সুধীর। তাই বোধহয় এই সব গল্পের কথকও সুধীর, অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র নিজেই। ঘনাদা লম্বা, শুঁটকো চেহারা, বয়সের গাছপাথর নেই, প্রচুর গড়গড়া টানেন এবং সিগারেটও খান, আবার ভয়ঙ্কর রকমের পেটুক। বলাই বাহুল্য, ঘনাদা একজন বুদ্ধিমান ও চারচোখো ব্যক্তি এবং তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। এত বিষয়ের খবর রাখেন, যা মেসবাড়ির সদস্যদের হতবুদ্ধি এবং প্রায় সম্মোহিত করে রাখে। ঘনাদা যে গুল ঝাড়ছেন তাতে তাদের সন্দেহমাত্র নেই, তবু ওই সব প্রকৃত তথ্যসমৃদ্ধ গালগল্প থেকে তাদের রেহাইও বা কোথায়. ঘনাদা যেন এক ম্যাজিশিয়ানের মতোই তাঁর কূটকৌশল দিয়ে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন।

মাঝে-মাঝে, মাঝে-মাঝেই বা কেন, প্রায় প্রতিটি গল্পের শুরুতেই ঘনাদাকে জব্দ করার জন্য ওই চার জনকে নানা প্ল্যান করতে দেখা যায়। কিন্তু কোনও দিন সেই সব প্ল্যান সফল হতে পারে না, ঘনাদার উল্টো চালে। ঘনাদা গুল মারেন জেনেও কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং তাঁর মন জুগিয়ে চলতে এই চার জনের প্রয়াসের অন্ত নেই। তার কারণ ঘনাদার গালগল্পের অমোঘ চমৎকারিত্ব এবং প্রবল আকর্ষণ।

বাংলা সাহিত্যে গুলবাজ চরিত্র বেশ কয়েক জন আছে বটে, কিন্তু সে সব চরিত্র নেহাতই মজার। ঘনাদার বৈশিষ্ট্য হল আজগুবি গল্পের বাতাবরণে নানা রহস্যময় অজানা তথ্যের উন্মোচন, যা ইতোপূর্বে আর কারও কলম থেকে বেরোয়নি। ঘনাদার অবিশ্বাস্য বীরত্ব বা কৃতিত্বের বর্ণনায় মজা আছে বটে, কিন্তু কাহিনি ও তথ্যে কোনও ভুলচুক নেই। সেই দিক থেকে ঘনাদা এক ও অদ্বিতীয়।

গল্পগুলির অবতারণাপর্ব অভিনব এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজস্বতার নির্ভুল ছাপ তাতে গভীর ভাবে আছে। প্রায় প্রতিটি গল্পের শুরুতেই দেখি ঘনাদাকে জব্দ করার বা মান ভাঙানোর পরামর্শ চলছে এবং নানা উদ্যোগ করা হচ্ছে। অবশ্যই ঘনাদার তথা ঘনশ্যাম দাসের চাতুর্যে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। আর তার পরই ঘনাদার গল্পটির অবতারণা হয়ে থাকে। প্রথমেই একটি বহ্বারম্ভ আছে, অর্থাৎ কয়েকটি আপাত পারম্পর্যহীন সঙ্কেতবাক্য। এবং তা নিয়ে শিবু গৌর, শিশির বা সুধীরের নানা টীকাটিপ্পনী। ঘনাদার উদ্দেশে কিছু চাপা ব্যঙ্গবিদ্রুপও বর্ষিত হয়, যাতে ঘনাদা বিন্দুমাত্র টলটলায়মান হন না। নির্বিকার মুখে দাবা-খেলুড়ির মতো গল্পের পরবর্তী মুভটি দেন এবং প্রতিপক্ষ যথারীতি মাত হয়ে যায়।

যেমন 'ধুলো' গল্পটি শুরু হচ্ছে এ ভাবে—

'বামুর্ডা, না বাহামা?'

তার পরই শিবু অ্যান্ড কোম্পানির নানা টিপ্পনী রঙ্গরসিকতা ইত্যাদির পর ঘনাদার দ্বিতীয় রহস্যময় সঙ্কেতবাক্যটি পাওয়া যায়—

'ফ্লোরা কি ডোরার দেখা অবশ্য তখনও পাইনি।'

তারও বেশ কিছুটা ন্যারেশনের পর আসে তৃতীয় বাক্য—

শিবু আর সুধীরের টিপ্পনি 'পেলে কী কেলেঙ্কারিই হত।' শুনে ঘনাদা তাঁর বাক্যটি প্রয়োগ করলেন, 'কেলেঙ্কারি বলে কেলেঙ্কারি। ওদের কারও সঙ্গে দেখা হওয়া মানে একেবারে দফা রফা।'

অর্থাৎ গল্পটি সোজাসুজি বলা নয়, একটু আলাপের পর বিস্তার। কিংবা গানের শুরুতে একটু তবলার বোল তোলা আর কী। এতে গল্পটির প্রতি পাঠকের আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে যায়, আর একটি সরসতার প্রলেপও লেগে থাকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প বলার এই স্টাইলটি খুব বেশি অনুসৃত হয়নি, কারণ এ ভাবে গল্প বলতে গেলে অনেকেরই ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হবে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র তাঁর নিজস্ব অর্জিত শৈলীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন

বলেই এত স্বচ্ছন্দে গল্পের গোলকধাঁধায় আমাদের ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খাইয়েছেন।

তবে এখানেও একটা কথা আছে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বা পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের যে নামকরণের প্রথা আছে, তা আজকাল বাচ্চারাও জানে। বিশেষ করে যখন বলাই হচ্ছে যে, এরা এক-এক জন পাঁচ-সাতশো লোককে খুন করেছে। কিন্তু এই সব গল্প যখন লেখা হয়েছে তখনও এই নামকরণের বিষয়টি বিশ্বজনীন ছিল না। হয়তো। এর পর হ্যাটি, ডোনা, হিল্ডা, হ্যাজেলের নামও এসেছে, যা শুনলেই আজকের যে কেউ বলে দিতে পারবে যে, এগুলো দক্ষিণ আমেরিকার সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। কিন্তু শিবু ও অন্যেরা এদের মেয়ে বলে ধরে নিয়েছিল।

পঁচাত্তর বছর আগে ঘনাদার প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়—'মশা'। আচমকাই এটি লিখে ফেলেছিলেন প্রেমেন্দ্র। এটি নিয়ে কোনও সিরিজ লেখার পরিকল্পনাই ছিল না তাঁর। কিন্তু প্রকাশের পর গল্পটির বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে তিনি ঠিক করেন ঘনাদার গল্প আরও লিখবেন। সেই শুরু হয়েছিল ঘনাদার জয়যাত্রা। 'মশা' গল্পটি কেমন? এক কথায় অনবদ্য। বিশেষ করে মৃত্যুর সাক্ষাৎ দূত কালান্তক মশাটির ঘনাদার এক চপোটাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, এই অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সটি বহু দিন মনে থাকবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন একজন লেখক বা কবি যিনি বিরল প্রতিভাবলে তাঁর যুগকে শাসন করতে পারতেন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, স্বয়ং জীবনানন্দ দাশ প্রেমেন্দ্রর কবিতার অন্ধ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে একরকম গুরু বলে মানতেন। কবিতাগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফেরা'-র জন্য প্রেমেন্দ্র আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

অথচ কবি প্রেমেন্দ্রকে বাঙালি এক রকম ভুলেই গেছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, অত বড় লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা নগণ্য। 'পাঁক' ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসও তেমন কিছু নেই। ঘনাদার গল্প বা পরাশর বর্মার রহস্য উপন্যাস তিনি যত লিখেছেন, সেই তুলনায় তাঁর সিরিয়াস গল্প-উপন্যাস সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তাঁর 'সাগরসঙ্গমে' বা 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর মতো অবিস্মরণীয় ছোট গল্প আছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় তা এতই সামান্য যে, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটি গল্পের সংখ্যাল্পতার জন্য নিতান্তই চটি একটি বই হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ কবি ও গোয়েন্দা পরাশর বর্মাকে নিয়ে গাদা গাদা উপন্যাস ও গল্প লিখলেন, ঘনাদার গালগল্প নিয়েই জান লড়িয়ে দিলেন, ভূতশিকারি মেজোকর্তার গল্পও লিখলেন, কিন্তু সিরিয়াস লেখার ব্যাপারে তেমন আগ্রহই দেখালেন না। ঘনাদার গল্পগুলি তথ্যভিত্তিক, উপভোগ্য, অভিনব বটে, কিন্তু তা কদাচ গভীর অভিনিবেশ দাবি করে না, কারণ সে সব চিন্তা উদ্রেককারী রচনা নয়। পরাশর বর্মা তো আরওই নয়। নিজের প্রতিভার প্রতি এমন অবিচার তিনি কেন করলেন সেটাই প্রশ্ন। আবার নিজের চিত্রনাট্যগুলি গ্রন্থাকারে উপন্যাস বলে প্রকাশ করে এক রকম দায় সেরেছেন, যেগুলি সিরিয়াস সাহিত্যপদবাচ্যই নয়।

শেষ পর্যন্ত পাঠকরা তাঁকে শুধু ঘনাদার স্রষ্টা হিসেবেই হয়তো মনে রাখবে। আর এটা একটু দুঃখেরও ব্যাপার। কারণ যত দিন যাবে, ততই ঘনাদার আকর্ষণ কিন্তু কমবে। কারণ বিজ্ঞান এগোচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তি এগোচ্ছে, ভৌগলিক জ্ঞানের প্রসার ঘটছে, অনেক বিস্ময় আর বিস্ময় থাকছে না।

মৌলিক কাহিনি-সার বিপণন সংস্থা' (মৌ-কা-সা-বি-স) একটি গুপ্ত সমিতি, যেখান থেকে পত্রমারফত ঘনাদার কাছে নানা রহস্যময় প্রশ্ন পাঠানো হয়, সমাধান দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, তা-ই কিন্তু ঘনাদার ভক্তদেরই কীর্তি। প্রেমেন্দ্র অবশ্য ঘনাদাকে নানা বিপন্নতায় নিক্ষেপ করেও লেজেগোবরে হতে দেন না শেষ অবধি। এই মৌ-কা-সা-বি-স নিয়েও বেশ কয়েকটা গল্প আছে। আদ্যন্ত মজার।

আমি সেই বাল্যকাল থেকেই ঘনাদার গল্প পড়ে আসছি। এখনও মাঝে-মাঝেই পড়ি। নতুন প্রজন্মের কাছে ঘনাদার আকর্ষণ কতটা তা জানি না, কিন্তু ওই গড়গড়ায় তামাক খাওয়া বা সিগারেটের টিন (যাতে পঞ্চাশটা সিগারেট থাকত) আত্মসাৎ করা, টঙের ঘর এবং সর্বোপরি আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানার বাতাবরণ আমাদের বাল্যস্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে এখনও। কিছু অসঙ্গতি সত্ত্বেও ওই মেসবাড়ি কলকাতার পুরোনো সব মেসবাড়িকে মনে করিয়ে দেয়। আর গল্পগুলির বৈঠকি মেজাজ তো তুলনাহীন।

আমার বিশেষ প্রিয় গল্পটি হল 'টুপি'। হিলারি-তেনজিং নোরগের এভারেস্ট জয়ের আগেই ইয়েতির সাহায্যে ঘনাদার এভারেস্টে ওঠার কাহিনিটি এত বিশ্বাসযোগ্য যে, মনে হবে, এমনটা তো হতেই পারে। তার ওপর হিমালয়ের ওই অঞ্চলের মানচিত্র এবং রোডম্যাপ যেন প্রেমেন্দ্র একেবারে ছকে দিয়েছেন। এই অসম্ভব কাজটি করতে তাঁকে কী বিপুল অধ্যয়ন করতে হয়েছিল, তা ভাবতে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। যে সব জায়গায় ঘনাদা অভিযান করেছেন, সেই সব জায়গায় প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনও যাননি। কিন্তু বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষবৎ। বড় লেখকের মেধা ও কল্পনাশক্তি সব খামতিকে পূরণ করে দিয়েছে।

কোনও কোনও গল্পে দেখছি ঘনাদা মেসের আড্ডাধারীদের তুইতোকারি করছেন। এটা ঘনাদার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়। তুইতোকারি করাটা অতিঘনিষ্ঠতার দ্যোতক, তাতে গাম্ভীর্য ও দূরত্বও বজায় থাকে না। ঘনাদার সঙ্গে শিবু-সুধীরদের সম্পর্ক ঠিক তুইতোকারির নয়। কাজেই একটু ছন্দপতন সেখানে ঘটে গেছে। আবার কিছু গল্প বিবৃত হয়েছে ভিন্ন পরিবেশে, লেকের ধারে অন্য আড্ডাধারীদের সমক্ষে। সেখানে দেখতে পাই বয়স্ক মানুষদের। স্ফীতোদর রামশরণবাবু, টেকো এবং প্রাক্তন ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবু, পক্ককেশ হরিসাধনবাবু এবং হস্তীর মতো বিপুলকায় ভবতারণবাবু। এঁদের জমায়েতে ঘনাদাকে পেটুক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়নি। এখানে তিনি রহস্যময় এক চালিয়াত, তা হলেও এই সব শিক্ষিত ও ওয়াকিবহাল মানুষদের ঘোল বড় কম খাওয়াননি। এই আসরেই ঘনাদা খানিক ইতিহাস, খানিক, রূপকথা মিশিয়ে 'রবিনসনন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন' গল্পটি ফাঁদেন। গল্পটি কিন্তু ভারী ভালো।

বাংলা রসসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও আলোকিত করে আছে ঘনাদার গল্পসমূহ। শুধু হাসির বা মজার গল্প বলে এগুলির মূল্যমান নির্ধারণ করা যাবে না। মজার আবরণে এবং হাসির মোড়কে এই সব গল্পে বিরল সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যা আমাদের আরও জানার আগ্রহকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে শুধু তথ্যই আহরণ করেননি, অনেক প্রশ্নও উস্কে দিয়েছেন। ঘনাদা চরিত্রটি সৃষ্টির জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি আমাদের অপরিসীম ঋণ রয়ে গেল।

মানুষকে বইমুখী করার কাজটি করেছে বইমেলা

কলকাতার বইমেলা যখন প্রথম শুরু হয়েছিল, তখন চূড়ান্ত আশাবাদীও এর সাফল্য বা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করেনি। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল ভারি অভিনব। আমরা তখন তরুণ কলমচি। তাই যেতুম আড়ে আড়ে দেখতে আমাদের বই কেউ ঘাঁটে কি না, হতাশ হতে হত। বইমেলায় তখন তেমন ভিড়ও হত না। কৌতূহলী কিছু মানুষ আসত মাত্র। খুব সোচ্চার ছিল লিটল ম্যাগাজিনের ছেলেরা। তারা ঘুরে ঘুরে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুকদের জোর করে পত্রিকা গছানোর চেষ্টা করত। আড্ডার পরিসর কিন্তু ছিল বেশ, গার্ডেন আমব্রেলার নীচে চেয়ার পাতা থাকত, সেখানে আড্ডা দিত, সুনীল-শক্তি-সন্দীপনরা।

ভিক্টোরিয়ার গা ঘেঁষে, রবীন্দ্রসদনের উল্টো দিকের সেই মেলাটি দু-তিন বছরের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বোঝা গেল, বই মানুষকে টানে, বইমেলা নিতান্ত শৌখিন সার্কাস নয়।

আমি বইমেলায় বরাবর একটু কমই গেছি, তার কারণ আমি ভিড়-ভীতু মানুষ, প্রচুর জনসমাগম আমার কাছে বেশ একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। তবে মাঝে মাঝে গিল্ড কর্তৃপক্ষ লেখক-পাঠক মুখোমুখি বসানোর অনুষ্ঠান করতেন, সেখানে সমরেশ বসু বা বুদ্ধদেব গুহর জনপ্রিয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরেই সুনীল এবং শক্তি থাকত, প্রবীণ লেখকরা সেই আসরে থাকতেন না।

রিলে প্রথায় গল্প বলার একটা অনুষ্ঠানও চালু ছিল। সেটাতে আমি কখনও যেতাম না, তুষার রায় বা তারাপদ রায়েরও বেশ একটা জনপ্রিয়তা ছিল কিন্তু, আর ছিল সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়েরও।

বইমেলা ব্যাপারটা যে সাহিত্যজগতে কতটা অনুকূল হয়েছে, তা আজকের বইমেলার তুমুল জনপ্রিয়তা দেখেই বুঝতে পারি। মানুষকে বইমুখী করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি কাজটি করেছে এই বইমেলা। এখন গাঁ-গঞ্জে অবধি বইমেলা হয়। লেখকদের বাদ দিলেও ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, কর্পোরেট সকলেই বইমেলায় নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন।

স্থানান্তরিত হতে হতে বইমেলার অধুনা ঠিকানা মিলনমেলা। এ জায়গাটা আমার কিছুমাত্র খারাপ লাগে না। যথেষ্ট পরিসর, ব্যবস্থাপনা রীতিমতো ভালো, তবে পরিচ্ছন্নতার কিছু অভাব রয়েছে-যেটা সহজেই মিটিয়ে নেওয়া যায়।

আমার সেই কুণ্ঠা আজও আছে। অনুষ্ঠানের প্রয়োজন না হলে আমি বইমেলায় যাই না, এখনও ভয় পাই। কিন্তু ভিড় যে হয়, হচ্ছে এই খবর কিন্তু আমাকে খুশিই করে, বইয়ের জয়কেই সূচিত করে এই জনসমাগম।

চলচ্চিত্র

উত্তম সংগ্রহ

তিনি সিগারেটকে শিগারেট বলতেন। প্রথম দিককার ছবিতে তিনি সংলাপ বলতেন, একটু দ্রুতগতিতে, সবটা ভালো বোঝা যেত না, প্রার্থিত বা উদ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া হতে পারত না, প্যান্ট পরতেন, বড্ড ঢোলা, আর ওর নাকটা হ্যাঁ, নাকটা খুব কিছু সুন্দর নয় কিন্তু, না কুচ্ছিৎ ও নয়, সুন্দর না কুচ্ছিৎ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, হ্যাঁ, ওঁর ঠোঁট বেশ পুরন্ত অর্থাৎ পুরু, মুখের মধ্যে ঠোঁটজোড়া খুব প্রমিনেন্ট কারও কারও কাছে আকর্ষক মনে হতেই পারে বাংলা সিনেমার মধ্যযুগে কিশোরী, তরুণী, যুবতী বা মধ্যবয়স্করা, অর্থাৎ যাঁরা এখন মা, মাসি, পিসি, ঠাকুমা বা দিদিমা তাঁরা কেন তাঁকে এত পছন্দ করতেন তা এখনকার অনেক তরুণী কিশোরী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, তবে কি তারা পছন্দ করে না তাঁকে? হ্যাঁ করে। তবে ক্রেজ নেই, উত্তমকুমারের লভ্য ফিল্মগুলোর সব কটাই টিভির কল্যাণে তারা বহুবার দেখেছে। বড্ড রোম্যান্টিক আর সুইট, বেশির ভাগ গল্পই ভ্যাদভ্যাদে, তখনকার এখনকার বেশির ভাগ বাংলা ছবিই তো ভ্যাদভ্যাদে আর বোকা-বোকা।

ওপরের মতগুলো আমার নয়। বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীর।

উত্তমকুমার ব্যায়াম করতেন, মাসাজ নিতেন বলে শোনা যায়। কিন্তু তাঁর কোনও মাচো ইমেজ ছিল না। যেমন প্রমথেশ বড়ুয়া, মুখখানা কবির মতো, ছবির মতো রোম্যান্সে ভরা, কিন্তু জামা খুললেই পৌরুষ ধুল্যবলুণ্ঠিত। জামা খোলা উত্তমকুমার প্রমথেশের চেয়ে বেশি প্রেজেন্টবল, কিন্তু হলিউড বা মুম্বই নায়কদের মতো পৌরুষদীপ্ত নয় তাঁদের শরীর। এখনকার তরুণ-তরুণী মাচো, সুগঠিত শরীর পছন্দ করে, মুখখানা তত সুন্দর না হলেও চলবে। কিন্তু হি-ম্যান হওয়া চাই।

উত্তমকুমারের নেগেটিভ দিকগুলো স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে, এই একজন মানুষ, বাংলা সিনেমার মধযুগে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে গোটা সিনেমাশিল্পকে শাসন করেছেন, পালনও করেছেন। শুধু উত্তমকুমাকে কাস্টিং করতে পেরে বহু ডুবন্ত প্রয়োজক আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন।

বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ধুকতে ধুকতে ফের অক্সিজেন পেয়ে তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়েছে। বাংলা সিনেমার পরম ভাগ্য যে এমন দুর্লভ নায়ককে মুম্বই কেড়ে নিতে পারেনি। অথচ নেওয়ারই তো কথা। বাংলা ছবিতে নাম করলেই মুম্বই তাঁকে গ্রাস করে নেবে, এটাই তো নিয়ম। উত্তমকে নেয়নি কেন? নিয়েছিল। সুচিত্রা সেনের মতো সুন্দরীকেও নিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যেন তাঁদের সঙ্গে মুম্বইয়ের একটা অবনিবনা থেকে গিয়েছিল। মুম্বই এবং এঁরা দুজনেই পরস্পকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

উত্তমকুমার যখন মধ্যগগনে তখন আমরা ছাত্র। শাপমোচন, সবার উপরে, এই সব হিট অগভীর প্যাচপ্যাচে সেন্টিমেন্টাল রোম্যান্টিক ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ঈষৎ বোধবিশিষ্ট মানুষ তেমন পছন্দ করছে না। তবে দুটি সুন্দর মুখশ্রী ছবির ত্রুটি ঢেকে দিচ্ছে। প্যাসোনেট চেহারার নায়ক এবং অতীব সুন্দরী, কিন্তু যৌন

আবেদননির্ভর নন, এমন একজন নায়িকা ক্রমশ অনিবার্য জুটি হয়ে উঠছে। বাংলা ছবির অনিশ্চয়তার লক্ষণ কাটছে। মানুষ ভরিয়ে দিচ্ছে বক্স অফিস। সেই সময় এই উত্থানের পাশাপাশি প্রায় নিঃশব্দে চলচ্চিত্রে আর একটি বন্ধ দরজা হঠাৎ হাত ধরে খুলে দিলেন দীর্ঘকায় একজন মানুষ। শুধু শরীরের নয়, দীর্ঘকায় ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বটিও। সত্যজিৎ রায়। ফিল্ম দুনিয়া নড়ে চড়ে বসল, বাংলা ভাষায় রচিত (নির্মিত?) চলচ্চিত্র সাহেবদের দেশেও সেলাম পেল সেই প্রথম। সত্যজিৎ প্রথাসিদ্ধ পথে হাঁটতেন না। উত্তমকুমারের মতো বক্স অফিস হিরো বা সুচিত্রা সেনের মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বিকে তিনি ডাকলেন না তাঁর কাজে। অথচ পাশাপাশি সমান্তরাল অবস্থান করতে লাগলেন তাঁরা।

সত্যজিতের ছবির ভিতরে আসতে লাগল নতুন নতুন মুখ, তাঁরই আবিষ্কার, তিনি নিজের ছবির নায়ক নায়িকা নিজেই তৈরি করে নিতে লাগলেন। নতুন এক রাবীন্দ্রিক চেহারার নায়কের আবির্ভাব ঘটল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শিশির ভাদুড়ির কাছে তালিম-পাওয়া মঞ্চ-অভিজ্ঞ সৌমিত্র উত্তমের সমান্তরাল উদিত হতে লাগল। শর্মিলা, অপর্ণা, প্রমুখ নায়িকারা আবির্ভাবেই চিনিয়ে দিলেন, তাঁদের জাত।

শেষ অবধি উপেক্ষা করেননি সত্যজিৎ, অন্তত দুটি ছবিতে তিনি উত্তমকুমারকে নিয়েছিলেন। 'নায়ক' অবশ্যই উত্তমকুমারের জীবন-কাহিনির আদলে গড়া যেন, আর পরিণত উত্তম কি অভিনয়টাই করেছেন নায়কে। সত্যজিতের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির একটি 'নায়ক'। উত্তমকুমারেরও। একটা দুঃখ, সত্যাজিৎ সুচিত্রা সেনকে নেননি কখনও। নিতেই পারতেন। সত্যজিতের হাতে সুচিত্রা সেনের ভিন্নমাত্রিক একটা অবদান থেকে যেত।

এই প্রতিবেদন উত্তমকুমারের মুল্যায়ন নয়। প্রতিবেদক চলচ্চিত্র আনাড়ি এবং আনপড়। উত্তমের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হচ্ছে একজন অদ্ভুত মানুষের জন্য। তাঁর নাম পরিমল রায়। এঁর ঝোঁক বা নেশা হল চলচ্চিত্রের পোস্টার, পুস্তিকা, আলোকচিত্র সংগ্রহ। কাজটি শুরু করেছিলেন বালক বয়সে। সযত্নে সংগ্রহ করা সেইসব পোস্টার ইত্যাদি পরম মমতায় সংরক্ষণ করে এসেছেন এতদিন। সংগ্রাহক তিনি আরও অনেক কিছুর। বিস্তর ফেলানি জিনিস তিনি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছেন নিজের ভাণ্ডারে। এর আগে তাঁর চিত্রায়িত নাটকের পোস্টার এবং সত্যজিৎ পোস্টার নিয়ে দুই প্রর্দশনী হয়ে গেছে কলকাতা আর শান্তিনিকেতনে। তারপর এই সম্প্রতি আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায়ের পরামর্শে রূপকলা কেন্দ্রের অধিকর্তা (কর্ত্রী নন?) অনিতা অগ্নিহোত্রীর অনুমোদনে নন্দন-৪ এ তাঁর উত্তমকুমারের পোস্টার নিয়ে উত্তম প্রদর্শনী হয়ে গেল। যাঁরা এই প্রদর্শনীতে গেছেন তাঁরা অবশ্য স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে পড়বেন। বয়স্কদের মনে পড়ে যাবে, যৌবন বা কিশোর বয়সে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটা এই সব পোস্টারের কথা। পোস্টার তাৎক্ষণিক বস্তু হারিয়ে যায় আর ফিরে আসে না। পরিমল রায় সেই সব বিস্মৃত পোস্টারকে জনসমক্ষে হাজির করে পুরোনো দিনের আভাস যেন ফিরিয়ে আনলেন।

কী উদীপ্ত, কী উৎসাহী, এই মানুষটি।

পোস্টারগুলি এখনও তরতাজা, যেন একটু আগেই ছাপা হয়েছে। কত যত্নে সংরক্ষিত হলে তবে এত পুরোনো কাগজের পোস্টার এত ঝকঝকে থাকে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। উজ্জ্বল হাস্যময় মুখে প্রবল উৎসাহে এবং গভীর মমতায় তিনি যখন তাঁর সংগ্রহগুলি দেখাচ্ছিলেন তখন মনে হয়েছিল, কিছু কিছু ভালোবাসার পাগলামি আছে বলে আমাদের সব কিছু কালস্রোতে ভেসে যেতে পারে না। এই যে কুড়িয়ে নেওয়া সযত্নে রক্ষা করা, ভালোবেসে লোককে দেখানো এই রক্ষণশীলতাই মাঝে মাঝে আমাদের জীবনে দুর্লভ এক আনন্দের স্পর্শ বয়ে আনে।

একটি ছবির কথা মনে পড়ছে, নাম বোধহয় 'উপহার', উত্তম তাতে নায়ক ছিলেন না, পার্শ্ব চরিত্রে এক অধ্যাপকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। গ্ল্যামার ঝেড়ে ফেলে সে যে কী দুর্দান্ত স্বাভাবিকতায় অভিনয় করেছিলেন, ভোলার নয়। সেই পোস্টারটা খুঁজে ছিলাম, পাইনি, যা পেলাম তাও বড় কম নয়। মোট ৬১টি পোস্টার, কয়েকটি আলোকচিত্র এবং পেনটিং, বেশ বড় ভোজের আয়োজন।

আমরা তাঁর পরবর্তী প্রর্দশনীর অপেক্ষায় রইলাম।